আলোর দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ

ড. তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন □ কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বর্ণসংস্থাপন : আই. ই. আর. ই., ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : কমলা প্রেস, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

আলোর দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ হোমাপাখি

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে একাধিকবার হোমাপাখির প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি বলেছেন : "বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেক দিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয় আর উঁচুতে উঠে যায়।"[১] এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'বেদ'-এর বিবরণ অনুযায়ী হোমাপাখির প্রকৃতি। হোমাপাখিকে কিছু বিশেষ বিশেষত্বের প্রতিভূ হিসাবে সাধারণতঃ তিনি বিবৃত করতে চেয়েছেন। কথামৃতের প্রথম হোমাপাখির উল্লেখে (৫ মার্চ, ১৮৮২) আমরা লক্ষ্য করি, নরেন্দ্রনাথের (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের) বিশেষত্ব বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ হোমাপাখিকে স্মরণ করেছেন। সেদিন নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে উপস্থিত ভক্তদের কাছে তিনি বলেছিলেন : "এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনো বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়।"[২] কথামৃতে হোমাপাখির দ্বিতীয় উল্লেখ (১১ মার্চ, ১৮৮৩) রাখালচন্দ্র (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রসঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের বাবা ও অন্যান্যদের কাছে বলছেন : "এসব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক — ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নেই। বেদে হোমাপাখির কথা আছে।... এসব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলায় সংসার দেখে ভয় পায়। এক চিন্তা কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।"[৩] কথামৃতে তৃতীয়বার হোমাপাখির প্রসঙ্গ এসেছে (৩০ জুন, ১৮৮৪); শ্রীরামকৃষ্ণ হোমাপাখির উপমা দিয়ে বললেন : "নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখির ন্যায়। তার মা উঁচু আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে।... কিন্তু মাটির গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা কোথায় মা! দেখ না প্রহ্লাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা!"[৪] এখানে উদ্দিষ্ট কে? কোন বিশেষ ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে এখানে উদ্দিষ্ট নন। তবে কথামৃতকার লিখছেন : "হোমাপাখির দৃষ্টান্তের দ্বারা [শ্রীরামকৃষ্ণ] কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন?" প্রাসঙ্গিক আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবৃত হোমাপাখির উপমায় কতকগুলি প্রায়োগিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা

যায়। বিশেষ ঊর্ধ্বচেতন মানসিকতা, বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরপ্রাণতার গভীরতা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ উপমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর যুবক শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র এবং তিনি স্বয়ং ছিলেন এগুলির সাকারমূর্তি।

বেদের কোন অংশে হোমাপাখির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (যা 'বৃহত্তর বেদ' বলে কথিত) হোমাপাখির প্রসঙ্গ বর্ণিত :

"অন্তরীক্ষেঽপি জায়ন্তে আকাশবিহগাদয়ঃ।
বনবীথিষু জায়ন্তে সিংহ ব্যাঘ্র মৃগাদয়ঃ॥"[৫]

— যেমন বনে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুগণ জন্মগ্রহণ করে তেমনি অন্তরীক্ষেও আকাশ পক্ষীসকল জন্মগ্রহণ করে।

হোমাপাখির কিংবদন্তী বিশ্বজোড়া। এই পাখির বিচিত্র রূপকথার গল্প শুনিয়েছেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বিবিধার্থ সংগ্রহে 'হোমা' প্রবন্ধে : "ঐ বিহঙ্গমের (হোমা) পক্ষ রাজমুকুটে ধারণ করা বহুকালাবধি প্রথা থাকায় এই মনোহর জীবের প্রশংসাসূচক নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচার হইয়াছে। মুসলমানদিগের বিশ্বাস আছে যে, তাহারা [হোমাপাখিরা] শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আহার করে না, এবং কদাপি ভূমিতে বাস করে না ; আজন্মকাল অন্তরীক্ষে থাকিয়া অণ্ডপ্রসবাদি তাহাদের জীবনের তাবৎ কর্ম সেই স্থানে নিষ্পন্ন করে ; অধিকন্তু যে-কোন ব্যক্তির শরীরে এই পক্ষীর ছায়ার স্পর্শ লাগলে সে অচিরাৎ রাজা হয়। প্রাচীন ইউরোপীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই গল্প শাখাপল্লবিত হইয়া বিলাতেও বহুকালাবধি প্রচারিত ছিল। তত্রস্থ লোকেরা কহিত হোমাপাখী শিশির পানকরতঃ জীবন ধারণ করে এবং পদ না থাকা প্রযুক্ত উহারা ভূমি স্পর্শকরণে অশক্ত ; কাহারও মতে ইহারা দগ্ধ হইলে পুনরায় ভস্ম হইতে আপন রম্য পক্ষ ধারণকরতঃ গাত্রোত্থান করে।"[৬]

হোমাপাখির এই রূপকথা ব্যাপ্তিতে কিরূপ বিশাল ছিল, কয়েকটি ঘটনা তার প্রমাণ দেয়। ষোড়শ শতকের প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অ্যান্টনিও পিগাফেটা[৭] হোমাপাখির প্রাণিতত্ত্বগত পরিচয় দিলে সকলে তাঁকে উপহাস করেছিলেন। পরবর্তী কালে অপর দুই বিজ্ঞানী মার্ক গ্রেব ক্লুসিয়াস ও বেষ্টিয়স[৮] ঐ পাখির পক্ষিবিজ্ঞানসম্মত তথ্য প্রচারে ব্যর্থ হন এবং সাধারণের কাছে তাঁরা উপহাস্যাস্পদও হন। কারণ, সমকালীন ব্যক্তিরা ঐ পাখির রম্যগল্পে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, দুই একজন যুক্তিবাদীর বক্তব্যকে তাঁরা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। আমরা আরও বিস্মিত হই যখন দেখি প্রাণিবিজ্ঞানী কনরাড গেসনারের বিবরণেও ঐ পাখির অলৌকিকতা বিধৃত : এই পাখিদের পুরুষের পিঠে গর্ত থাকে— উড়নকালে জননী পাখি পুরুষের পিঠের গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। উড়ন্ত অবস্থায় জননী পাখি ডিমে তা দেয়। আকাশেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।[৯] মালাক্কা (মালয়) দ্বীপের অধিবাসীরা এই পাখিকে বলত 'মানু-কো-দেবতা' অর্থাৎ 'দেবতার পক্ষী'। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা থেকে জানা যায় যে, হোমাপাখির রূপকথা ভিত্তি করে সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লিনিয়াস এই পক্ষীর জাতিবিশেষের নাম দেন 'নিষ্পদ স্বর্গীয় পক্ষী' (Apodous Paradise Bird)।[১০]

হয়তো লৌকিক বিশ্বাসকে ইতিহাস করতে চেয়েছিলেন এই প্রাণিবিজ্ঞানী। তাই পক্ষিবিজ্ঞানের নথিতে হোমা হয়ে গেল 'প্যারাডিসিয়া অ্যাপোডা' (Paradisea apoda)।[১১]

হোমা তথা রূপকথার স্বর্গীয় পাখি এবং বাস্তবের হোমা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'Paradise bird' বলে চিহ্নিত হলো। অলৌকিকতা-ভরা হোমাপাখির সত্যসন্ধানে একাধিক অভিযানের কথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নথিভুক্ত আছে। ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ্ ওয়ালেশের[১২] জাহাজ নিউগিনি দ্বীপে ভিড়েছিল স্বর্গীয় পাখির সন্ধানে। সেখানে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেও তিনি ঐ পাখির রূপকথার বৈশিষ্ট্য মেলাতে পারেননি। কিন্তু তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ঐ পাখিদের 'বাহারি ডানার বিলাস' দেখে। ঐ পাখিকে বর্তমানে প্রাণিবিদ্‌গণ বলেন 'Paradise flycatcher'।[১৩] বাঙলায় এর নাম 'শাহ্ বুলবুল'।[১৪] রেশমী ওড়নার মতো এদের লেজে থাকে লম্বা পালক; স্বভাবে চঞ্চল, খাদ্য প্রকৃতিতে সর্বভুক, মাথায় ঝুঁটি, পালকে থাকে বিচিত্র বর্ণবাহার, আর ডানায় থাকে অপরূপ উজ্জ্বলতার দ্যুতি। বিজ্ঞানী হার্মার ও সিপলি হোমাপাখির প্রজাতি ভেদে রঙের বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন: "বাদামী হোমাব নাম প্যারাডিসিয়া অ্যাপোডা, রক্তিম হোমার নাম প্যারাডিসিয়া রুব্রা এবং হলুদ হোমার নাম প্যারাডিসিয়া র‍্যাগিয়ানা।"[১৫] কাজেই হোমাপাখির রূপকথা বিজ্ঞাননির্ভর না হলেও হোমাপাখির অস্তিত্বে বৈজ্ঞানিক সত্যতা বর্তমান।

এখন আমরা দেখব শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত 'হোমাপাখি' উপমার সঙ্গে বাস্তব হোমাপাখির সাদৃশ্য কিরূপ এবং তাঁর উপমা নির্বাচনের প্রায়োগিক তাৎপর্য কতখানি? শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ধৃতির মধ্যে হোমাপাখির যে দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় তা হলো তাদের স্থায়ী আকাশচারী প্রবণতা ও সদ্যোজাত পাখির উড়ন ক্ষমতা। হোমার প্রথম বৈশিষ্ট্যে বিশেষজ্ঞদের সমর্থন পাওয়া যায়। হার্মার ও সিপলি উল্লেখ করেছেন: "হোমাপাখিরা উঁচু পর্বতশীর্ষে ও সুদীর্ঘ বৃক্ষের শাখায় থাকতে পছন্দ করে; অনেক প্রজাতির ডিম ও বাসার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি।"[১৬] ভারতীয় পক্ষিবিশারদ সালিম আলি লক্ষ্য করেছেন: 'হোমাপাখি উড়ন্ত অবস্থায় ডানার সাহায্যে পতঙ্গ শিকার করে খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা মেটায়।"[১৭] দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির সমর্থন অবশ্য জীববিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "অনেক দিন ধরে ডিম পড়তে থাকে... পড়তে পড়তে চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয় এবং ছানা মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়।" তবে এই বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট যে, এই পাখির ইনকুবেশন কাল (Incubation period) বা 'তা'-দেওয়ার সময় অল্প এবং প্রথমে শিশুপাখির চোখ ও ডানা থাকে না— ক্রমে সেগুলি ওদের দেহে গজায়। "মা'র দিকে চোঁচা দৌড়" বক্তব্যে প্রসূতি পাখির শিশুপ্রযত্নের' (Parental care of young one's) কথা ব্যক্ত। এই সমস্ত লক্ষণই পক্ষিবিজ্ঞানসম্মত। ভারতীয় পক্ষিবিজ্ঞানী জামাল আরার বিবরণ থেকে জানা যায়: "হোমা পাখিদের তা দেবার কাল অন্যান্য বৃহদায়তন পাখিদের তুলনায় অনেক কম।"[১৮] এদের শিশুপ্রযত্ন সম্বন্ধে

বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পক্ষিবিজ্ঞানী ও হোমাপাখি বিশেষজ্ঞ ব্রুশ. এম. বিহ্লার।[১৯] কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণবর্ণিত হোমাপাখির বিবরণ অলৌকিকতার ঊর্ধ্বে বৈজ্ঞানিক তথ্যেরও সন্ধান দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যতা এই উপমার নির্বাচন দক্ষতায়। হোমাপাখির প্রাণিবিজ্ঞানগত প্রকৃতি নিঃসন্দেহে অভিনব—আকৃতি ও প্রকৃতিতে সে অপূর্ব সৌন্দর্যের দাবিদার। পক্ষিবিজ্ঞানীরা হোমাপাখির সৌন্দর্য বর্ণনায় মুখর। কেউ বলেছেন : "অপরূপ স্বর্গের দেবদূত"[২০] ; কেউ বলেছেন : "অতুলনীয় সৌন্দর্যের আধার"[২১] ; আবার কেউ হোমাকে অভিহিত করেছেন "স্বতন্ত্র সুন্দর"[২২] বলে। নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ তিন ব্যক্তিত্ব। দৈহিক সৌন্দর্য তাঁদের তো ছিলই, তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁদের জগতের ঊর্ধ্বে বিচরণকারী অত্যুচ্চ অনুভূতিসম্পন্ন মন ও মানসিকতা। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার সার্থকতা। আবার অতীন্দ্রিয়বাদ এবং বিজ্ঞান—দুয়ের মিলন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রসিদ্ধ উপমায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐতিহ্যে ও আধুনিকতায় এক অনন্য পুরুষ

শ্রীরামকৃষ্ণ ঊনিশ শতকের চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। প্রজ্ঞায় যিনি বুদ্ধ, প্রেরণায় যিনি বন্ধু, প্রতিজ্ঞায় যিনি অকুতোভয়: বিশ শতকের বিজ্ঞান বিজয়ে যিনি তাবৎ বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশ্বব্যাপী টানাপোড়েনে যিনি মানুষের শেষ আশ্রয়—সেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই আলোচনার শিরোনাম। তাঁকে কেউ বলেছেন, 'হাজার বছরের সাধনার ঘনীভূত প্রকাশ',[১] আবার কেউ বা বলেছেন, 'ভারতাত্মার বিশুদ্ধ রূপ'[২]। তিনি কখনো বন্দিত হয়েছেন 'এক phenomenon'[৩] নামে, কখনো বা বিশেষিত হয়েছেন 'এক ডায়নামিক মিষ্টিক'[৪] অভিধায়। অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি শ্রীরামকৃষ্ণ অবমূল্যায়নের প্রবণতা এখনো বহমান। অধুনার সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে এ অবমূল্যায়নের অপচেষ্টা লক্ষিত হয়। অনেকের ধারণা তিনি 'পুরোহিত থেকে অবতার হয়েছেন'[৫] লোকের ঢক্কা নিনাদে কেউ কেউ নতুন করে ভাবতে চাইছেন তিনি অলৌকিকতাবাদী[৬]। ইতিহাসের লজ্জাকর বিষয় এইটাই। যে ব্যক্তিত্বের বিকল্প সমাজ আজও সংগ্রহ করতে পারেনি—তার প্রতি এহেন কটাক্ষ অগভীর চিন্তা-চেতনারই পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব—সাধক হিসাবে নয়, কালী-ভক্ত হিসাবেও নয়— হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়ক হিসাবেও নয়। তিনি বরেণ্য—তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশধারার জন্য। আমার পাঠককে অনুরোধ, সেই বিশাল ব্যক্তিত্বকে সন্তর্পণে অনুসরণ করতে এবং তারপর তার মূল্যায়নে অবতীর্ণ হতে। তা না হলে ঘটবে ইতিহাসের চরম অবিচার। এ নিবন্ধের অবতারণা সেই প্রেক্ষাপটে।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে প্রত্যয় বিন্যাস: বিষয়বস্তুর বিবরণে প্রবেশ প্রাক্কালে অধুনা আলোচিত কিছু প্রসঙ্গে আলোকপাতে আমরা আগ্রহী। অধুনার সমালোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভাবসমাধি' ও তাঁর 'কালীর নাম স্মরণ' প্রসঙ্গের পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর ভাবসমাধি, ধাতুর স্পর্শে হাত কনকন করে ওঠা, অপরের প্রহারের দৃশ্য দেখে নিজ দেহে আঘাতচিহ্ন ফুটে ওঠা ইত্যাদি অলৌকিকতা বলে অনেকে চিহ্নিত করতে চান।[৭] সংশ্লিষ্ট ভাব ভাবনার প্রত্যুত্তরে বলা যায়—'ধ্যান' ভারতীয় আধ্যাত্মিক চর্চার বিশেষ অঙ্গ বলেই কথিত। এ জাতীয় শরীরচর্চা মানবিক প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ শর্ত। মনের ক্রিয়া শরীরযন্ত্রের মস্তিষ্কের ক্রিয়া পারম্পর্যেই

অনুষ্ঠিত হয়। স্নায়ুতন্ত্রের জটিল ক্রিয়া সুসংহত রাখায় যোগাসনের (ধ্যানের) যে ভূমিকা আছে শারীরবিজ্ঞানিগণ তা স্বীকার করেন।[৮] Transcendental Meditation তথা 'রাজযোগ' অভ্যস্ত ব্যক্তির দেহে EEG (মস্তিষ্ক তরঙ্গ), হৃৎস্পন্দন, হৃৎঘাত, শ্বাসহার, রক্তে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড আধিক্য প্রভৃতির পরিবর্তনের পরীক্ষিত লক্ষণ একাধিক শারীরবিজ্ঞানের গবেষণাপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।[৯] এবং আরো বিস্ময়কর সংবাদ হল, পূর্ণধ্যানরত ব্যক্তির মস্তিষ্ক-তরঙ্গের আলফা রশ্মির সক্রিয়তা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক।[১০] শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসংশ্লিষ্ট ক্রিয়া পারম্পর্যকে অনেকে এপিলেপসি, হিপনোসিস ও অন্যান্য স্নায়বিক বিকৃতি নামে অভিহিত করেছেন।[১১] সংশ্লিষ্ট ভাব পোষণকারীদের সৌজন্যে অবগত করানো যায় ধ্যানতন্ময়তাজনিত মস্তিষ্ক-তরঙ্গ, অস্বাভাবিকতাজনিত (এপিলেপসি, হিপনোসিস প্রভৃতি) মস্তিষ্কতরঙ্গ প্রকৃতি এক নয়।[১২]

বা awareness-কে fit করা সম্ভব নয়। সেই অনন্যতাকে অলৌকিক শিরোনামে আভাসিত করা অন্যায়—বরঞ্চ লৌকিক চেতনায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ভাবাই সঙ্গত।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে প্রায়োগিক বিন্যাস: পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে প্রত্যয় বিন্যাসের বিজ্ঞাননিষ্ঠ বিশ্লেষণে তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেছি। এই অধ্যায়ে লক্ষ্য করব তাঁর চেতনার অনুশীলনেও সে স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। তাঁর মননশীলতায় আধুনিকতার সঙ্গে কী বিস্ময়কর মৌলিকত্ব বিরাজ করত তাঁর যে কোন জীবনীগ্রন্থ সঠিক অধ্যয়ন করলেই অনুভব করা যাবে।

কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্ত কিন্তু অর্থ ও রমণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল: শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, তিনি বলতেন; "কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হবে না।"[১৮] সেই সূত্র ধরে বহু অপব্যাখ্যা ঘটেছে।[১৯] বস্তুতঃ তাঁর ঐ উক্তির যথার্থ মূল্যায়ন আবশ্যক। তাঁর উক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল ঊনিশ শতকের উপনিবেশবাদ রচিত নয়া অর্থনীতির বাহ্যাড়ম্বর ও বাবু কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সেই সমাজে তখন হঠাৎ বেনিয়াবাবুদের আমদানী হয়েছিল এবং তারা সীমাহীন অনৈতিকতা ও চরম ভোগবাদে দিনযাপনে রত ছিল। সমকালীন ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এই সত্য সহজে প্রতীয়মান হয়। তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছিল, অধুনা এই নগরে রাজশাসন অভাবে যেমন মদ্যপানের বাহুল্য হইতেছে তদ্রূপ দিন দিন বেশ্যাশ্রেণীও বৃদ্ধি হইতেছে।... বেশ্যাগমন-পাপ এই ক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্তী, অতিদীন পর্যন্ত এই দুষ্কর্মে এমন সাধারণরূপে মগ্ন হইয়াছে যে, অন্য অন্য কর্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারো নিকটে বিশেষ গোপন করে না—আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জাবোধ করে না।"[২০] এহেন সমাজ মানসিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ভোগবাদের প্রতি ধিক্কার প্রদর্শন করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি অর্থ ও নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অর্থের প্রতি তাঁর অনীহা সর্বজনবিদিত। তিনি টাকাকে মাটির তুল্য জ্ঞান করতেন। বহুমূল্য শাল ও অর্থ তাঁর শরীরে অসুস্থতা এনে দিত—এঘটনাও অনেকের জানা। কিন্তু সেই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে শ্রমজীবীর ন্যায্য শ্রমের মূল্যে তিনি অত্যন্ত সচেতন—এবং তাদের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হয়েছেন বার বার।[২১] যোগীন্দ্রনাথকে বলেছেন, "ওরে! গৃহস্থের রক্ত ওঠা কড়ি অপব্যয় করতে নেই।"[২২] বলেছেন, "যে বাক্সতে টাকাকড়ি থাকে তাকে যত্ন করা উচিত।"[২৩] এ তো গেল অর্থের কথা; নারীকে তিনি জগন্মাতার অংশ মনে করতেন। তাঁর মতে "সব নারীই শক্তিরূপা, সব যোনিই মাতৃযোনি। পতিতা ও সতীলক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ নেই।"[২৪] শিষ্য হরিনাথকে বলেছিলেন, "মেয়েদের ছোট করে দেখবি না—তাদের মনে করবি জগদম্বার অংশ।"[২৫] যে যুগে নারীর প্রতিশব্দ 'অবলা' সেই যুগেই তিনি এক নারীর অধীনে (রাণী রাসমণি) চাকরি করেছেন: নারীকে গুরুরূপে (ভৈরবী ব্রাহ্মণী) বরণ করেছেন। লোকশিক্ষার জন্য একাধিক নারীর (শ্রীশ্রীমা ও গৌরীমা) ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।"[২৬]

ব্যক্তিজীবনে পূর্ণত্যাগী কিন্তু সংসার ত্যাগ বাধ্যতামূলক বলেননি : ব্যক্তিজীবনে তিনি ত্যাগের মূর্তিমান বিগ্রহ ; ঘোষণা করেছেন, "ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।"[২৭] কিন্তু এর জন্য সংসার ত্যাগ বাধ্যতামূলক বলেননি। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর লাভের জন্য জগৎ, জীবন ও সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই— গৃহস্থাশ্রমেও ঈশ্বর লাভ সম্ভব। সংসারের মধ্যে থেকে ঈশ্বর চিন্তাকে তিনি 'বাহাদুরী' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[২৮] সন্ন্যাস জীবনযাপন করেও স্ত্রী ও মাতার প্রতি বিন্দুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। এমনকি বহুসংসারী ব্যক্তিকেও সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

ধর্মপথের ঋত্বিক হয়েও লম্পট, মাতাল ও বেশ্যাদের ব্রাত্য বলে বর্জন করেননি : তিনি ব্যক্তিজীবনে কখনো মদ পান করেননি, কখনো মিথ্যা বলেননি, আজন্ম ব্রহ্মচর্য পালন করে গেছেন, তথাপি সমাজের ঘৃণিত মাতাল, লম্পট ও বেশ্যাদের আশ্রয়দাতারূপে তিনি চিহ্নিত। এ বড় বিরল ব্যক্তিত্ব। যে সমাজে বা এখনো কেউ এজাতীয় সমাজ পরগাছাদের আশ্রয় দেয় না এবং তাদের কল্যাণের কথা ভাবে না। মদ্যপ পদ্মবিনোদ, লম্পট গিরিশচন্দ্র, পতিতা বিনোদিনী—সবাই তাঁর আশ্রয় পেয়ে জীবনের তীর্থে পৌঁছাতে পেরেছে।[২৯] শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহচর্য মদ্যপ গিরিশকে করেছে 'ভক্তভৈরব'। তাই পরিণত বয়সে গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন, "তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানা, ভালোবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।[৩০] পতিতা বিনোদিনীর লেখনীও এ প্রসঙ্গে বড়ই উল্লেখের : "জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে, পরমারাধ্য পরমপূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমায় কৃপা করিয়াছিলেন। তাঁর সেই পীযূষ পূরিত আশাময়ী বাণী : 'হরিগুরু... গুরু হরি' আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে।"[৩১]

সমাজসংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতা নন কিন্তু বোদ্ধা সংগঠক ও দক্ষ পরিচালক : শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যিক সংস্কার চাইতেন না। চাইতেন আমূল সংস্কার। বলতেন—মন-মুখ এক করতে। তাই দেখি তিনি তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকদের চেয়েও অতিরিক্ত প্রগতিবাদী। সেইরূপ শিক্ষা দিয়ে গেছেন তাঁর পার্ষদবর্গদের। তাঁর চিন্তা ও চেতনার বিস্তারের জন্য তিনি তরুণদের ওপরই বেশী নির্ভর করেছিলেন ; তাদের জন্য পাগল হয়েছেন, কাতর স্বরে কুঠির হতে চিৎকার করে ডেকেছেন—"ওরে তোরা কে কোথা আছিস আয়।"[৩২] মানুষকে ভালবাসতেন বলেই, "ক্রমাগত জনতার স্রোত তাঁকে বেষ্টন করে থাকত।"[৩৩] তাঁর এই গণসংগঠন প্রসঙ্গে জনৈক বস্তুবাদী ঐতিহাসিক বলেন, "যে ধর্মসংস্কারে তিনি ব্রতী হন সেখানে ধনী-নির্ধন, উচ্চ নীচ সব সমান ; সবাই মায়ের সন্তান। তখনকার সমাজের হাওয়ার সঙ্গে এই ধর্মীয় সাম্যবাদ সহজেই সঙ্গতি খুঁজে পেল। জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত মানুষকে এক মায়ের আহ্বানে সামিল করে রামকৃষ্ণ তখনকার সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই ঐক্যবোধ সেদিনকার জাতীয় আন্দোলনের ছিল এক পরম সম্পদ।"[৩৪] এইভাবেই

তিনি তাঁর পার্ষদমণ্ডলীর মধ্যে এক বিশেষ সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন---যা পরবর্তীকালে 'রামকৃষ্ণ মিশন'— সেবক সংঘ রূপে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত।

সাধক কিন্তু তান্ত্রিক নন: শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বাদশবর্ষকাল কঠিন-কঠোর সাধন পরিক্রমার কথা প্রায় সকলেরই জানা। বিভিন্ন ধর্মমতের অনুশীলন এবং নিজেকে সেই ধর্মমতের সামিল করার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ ও নিষ্ঠা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শতকের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও প্রজ্ঞাকে অকুণ্ঠ চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[৩৫] কিন্তু ধর্ম সাধনার নামে তিনি 'বামাচার', 'হঠযোগ', ঝাড়ফুঁক' বা 'সিদ্ধাই' সমর্থন করেননি।[৩৬] তাঁরই নির্দ্বিধ ঘোষণা : "যারা সিদ্ধাই চায় তারা হালকা থাকের লোক।"[৩৭]

সাকারবাদী কিন্তু নিরাকারবিরোধী নন: ইতিহাস বলে, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক। ধর্মের গোঁড়ামী, মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িকতাকে 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩৮] এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, "এমত ভাল নয়।"[৩৯] তিনি নিজেই বলেছেন, "আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হয়েছিল---হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান---আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।" তিনি বিশ্বাস করতেন নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।[৪০] এই প্রত্যয় বোঝাতে 'বরফ ও জলের' উপমা দিয়েছেন বার বার।[৪১]

বেদ-বেদান্তে বিশ্বাসী কিন্তু শুষ্ক আচারবাদী নন: শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। আচারতন্ত্রকে তিনি ঘৃণাই করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতীয়া নারী ধনী কামারণীর অন্নগ্রহণ করেছেন—তাঁকে ভিক্ষামাতা বলে সম্বোধন করেছেন; শূদ্রজাতীয় রাণী রাসমণির মন্দিরে পূজারীব পদ গ্রহণ করেছেন, কাঙালীর এঁটো খেয়েছেন, মুসলমানের ছোঁয়া জিনিস গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়, মেথরকে আলিঙ্গন করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। সমকালীন সমাজে এ সমস্তই ছিল জাতিচ্যুতির সমান। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এ সমস্ত হেলায় উপেক্ষা করেছেন। তাঁর কথা হল, "ভক্তের জাতি নাই... অথবা চণ্ডালের ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না।"[৪২]

গৃহী কিন্তু গৃহস্থ নন: শ্রীরামকৃষ্ণ মনেপ্রাণে গৃহধর্মকে অশ্রদ্ধা করেননি। তিনি সংসারধর্মমতে বিবাহ করেছেন— স্ত্রীর দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন— স্বীয় জননীকে কাছে রেখে তাঁর সেবাযত্নের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু গৃহস্থের মত বদ্ধজীবী হননি; ঈশ্বরসাধনা করতে গিয়ে ভুলেও বিষয়, ধন, মান, যশ ইত্যাদির কামনা করেননি। গৃহস্থের ন্যায় কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর দাস হননি কখনো। এমন কি গৃহস্থের অনিবার্য যন্ত্রণা—রোগ, শোক ও দারিদ্র্যকেও হেলায় উপেক্ষা করেছেন। বিষয়বুদ্ধি রাখেননি মনে এবং প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে ঈশ্বরকে জানিয়েছেন "যেন ভোগাসক্তি যায়; আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।"[৪৩]

সত্যের গোঁড়া সমর্থক কিন্তু আধুনিকতার বিপক্ষে নন: শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল যোগী

বা সাধক নন, তিনি যুক্তিবাদী মানুষও। সেই সঙ্গে তিনি বাস্তববাদীও। তিনি বলতেন, "ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন ?"[৪৪] তিনি মনে করতেন আরশোলা বা ছারপোকার প্রতি অহেতুক দয়া দেখানো অনাবশ্যক[৪৫] ভদ্রতার নামে কাপুরুষতার হেয় জ্ঞান করতেন ; সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করলেও নপুংসক হতে নিষেধ করেছেন :[৪৬] ব্যস্ততার নামে অগোছাল হওয়াকে ধিক্কার দিয়েছেন। কাম সম্পর্কে শুচিবাইগ্রস্ত হতে নিষেধ করেছেন ; বলেছেন, "কামনা এক অপরিহার্য জীবনীশক্তি—একে এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করা বা ধ্বংস করা যায় না। এ শক্তিকে ঈশ্বরমুখী করতে হবে।"[৪৭] যুবক ভক্তদের বলতেন, "কাম ক্রোধের মোড় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দাও।"[৪৮] তাঁর ত্যাগ প্রবণতা ঈশ্বরের নিকট সব কিছু ত্যাগ করতে উৎসাহী করেছিল কিন্তু সত্যকে তিনি ঈশ্বরের নামে বিসর্জন দিতে পারেন নি। তাঁর কথা : "যে সত্যটিকে ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।"[৪৯] আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি এহেন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি বিজ্ঞানমনস্কতার পূর্ণ ধারক ও বাহক। ধর্মীয় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সোচ্চার ঘোষণা : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।"[৫০] তিনি সাধন সমরের জ্বলন্ত হোমাগ্নি হয়েও দেখতে যান—সার্কাস, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা ও থিয়েটার। সেই তিনিই আবার পছন্দ করেন তাঁর পার্ষদবর্গের পরস্পরের মধ্যে ইংরাজীতে কথাবার্তা।

নামযশের অনাকাঙ্ক্ষী কিন্তু লোককল্যাণের দুর্বার সৈনিক : শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে তিনি নাম-যশের প্রত্যাশা করতেন না। 'লোকমান্য' তিনি চাননি। তিনি জানতেন, "চাপরাশ ছাড়া লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।"[৫১] ঈশ্বরপ্রেমিক আপনভোলা এ বিচিত্র ব্যক্তিত্ব কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবেননি। তাঁর কথা, "মাটির প্রতিমায় পূজা হয়—আর মানুষে হবে না ?"[৫২] তিনি আরো বলেছেন, "মানুষ কি কম গা ?"[৫৩] দরিদ্র জনগণের জন্য তাঁর ব্যাকুলতার অসংখ্য নমুনা তাঁর জীবনীগ্রন্থে বিবৃত আছে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে নিজের আসন করে নিয়েছিলেন ; ধর্মের কঠিনতম তত্ত্বকে অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় প্রচলিত উপমার সাহায্যে মানুষকে বুঝিয়েছেন। লোকে সহজেই তাঁর কাছে তাদের আশ্রয় পেয়েছে। তাই তাঁর ধর্ম হয়েছে 'গণধর্ম'—তাঁর চেতনা 'গণচেতনা' এবং তাঁর শিক্ষা 'গণশিক্ষা'। তাঁর শিক্ষাই বিবেকানন্দের কণ্ঠে বাণীমূর্তি পেয়েছে—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[৫৫]

উপসংহার

আলোচিত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে প্রত্যয় ও প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট আলোচনার ধারায় লক্ষ্য করা গেছে—তাঁর জীবন ও কর্ম কোনখানেই অলৌকিকতার ধোঁয়াশা নেই। 'দর্শন' মণ্ডিত সে জীবন হলেও বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ ও পর্যবেক্ষণ কৌশল প্রতিনিয়ত সেখানে অনুশীলিত হয়েছে। এবং সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যতা। তাই তিনি ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র চরিত্র। মৌলিকতাই তাঁর বিশেষত্ব। প্রথানুগ কোন নিয়মরীতিতে তাঁকে বাঁধা যায় না। সেই কারণেই তিনি বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় আদর্শ—অনুসরণীয় লোকশিক্ষক। তাই তাঁর ধর্মকে "যে কেউ যে কোন নামে চিহ্নিত করতে পারে—হিন্দুরা বলে হিন্দুধর্ম, অন্যেরা তাদের রুচিমত নাম দেয়।"[৫৬] তাঁর এই সর্বজনীনতার জন্য তাঁকে ঋষি, দার্শনিক, সংস্কারক, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, কবি, শিল্পী—এমনকি 'একজন যথার্থ মানুষ' অভিধায়ও অভিহিত করা চলে। কারণ সবেতেই তিনি মূর্তিমান সত্য। বোধহয় তাঁর প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর কথাই যথার্থ :

"সত্য সর্বদা বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে—বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ ও অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।"[৫৭]

তথ্যসূত্র :

১. রামকৃষ্ণের জীবন —রোমাঁ-রোলাঁ (অনুবাদ ঋষি দাস), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৪৯, পৃঃ ১৩-১৪

২. দেশ, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৩৭৮, পৃঃ ১১-১৬ [জার্মান পর্যটক ম্যাক্সিমিলিয়াম রাগিষ্ট রামকৃষ্ণকে 'ভাবতাত্মার বিশুদ্ধ রূপ' বলে চিহ্নিত করেছেন।]

৩. রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ—ক্রিস্টোফার ইশারউড (অনুবাদ—রবিশেখর সেনগুপ্ত), মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা ১৩৩৮, পৃঃ ১-২

৪. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ : সম্পাদনা ; স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী চৈতন্যানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ১৭৪ [ঐতিহাসিক চার্লস হেমস্যাথ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 'মিষ্টিক' বিশেষণ আরোপ করেছেন।]

৫. উৎস মানুষ

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭২ বর্ষ ১২৮ সংখ্যা, ৩১শে আষাঢ়, ১৪০০ (বিপ্লব মুখোপাধ্যায় ও পাঁচু রায়ের পত্র দ্রষ্টব্য/ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অলৌকিকত্ব)

৭. তদেব,

৮. Human Physiology - B. K. Chakraborty, H. N. Ghosh and S. N. Sahana, The New Book Stall, Calcutta, 1984, p. 1237-1244

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমকালীন প্রতিক্রিয়া

শ্রীরামকৃষ্ণ উনিশ শতকের এক চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব, আর বিশ শতকের শেষ ধাপে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশ্বের শেষ আশ্রয়। আদর্শ ও ঐতিহ্যের এক অনন্য মিশ্রণ শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে কেউ বলেছেন 'Entire orbit of Hindusim'[২], কেউ বলেছেন 'phenomenon'[৩]। শতবর্ষ অতিক্রম করে যন্ত্রসভ্যতার বিজয় বৈজয়ন্তীর দিনেও রামকৃষ্ণ-জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ অবমূল্যায়নের প্রবণতাও কম নয়। তাঁকে অনেকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের নায়ক হিসাবে চিত্রিত করতে চান।[৪] আবার কেউ কেউ বলতে চান তিনি অলৌকিকতাবাদী[৫]। বাক্ স্বাধীনতার জোরে ইদানিং কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, রামকৃষ্ণকে পুরোহিত থেকে অবতার বানিয়েছেন মথুরামোহন, হৃদয়নাথ ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী।[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় এসেছেন ১৮৫৩ সালে। তারপর তাঁর দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে পৌরোহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ—পরে সে বৃত্তি থেকে নিষ্পত্তি—তারপর গভীর সাধনায় একাগ্রচিত্তে নিজেকে নিযোগ—সেখান থেকে লোকশিক্ষার কাজে আমৃত্যু সংগ্রাম। সংক্ষেপে এ হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের অক্ষ। এই অক্ষের ভূমিতে আসীন বালক গদাধর এবং শীর্ষে অধিষ্ঠান করছেন প্রজ্ঞাময় শ্রীরামকৃষ্ণ।

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি Phenomenon. কলকাতার সমাজ যে তাঁকে সহজে স্বীকৃতি দেয়নি—সমকালীন ইতিহাসই তার প্রমাণ। সে ইতিহাসের সঠিক পরিচিতির অভাবেই এ জাতীয় বেওয়ারিস মন্তব্যের বাহার। পাঠককে ধৈর্য ধরে সেই প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস অনুধাবনের জন্য অনুরোধ জানাই। সে ইতিহাস অজ্ঞাত থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের dimention বোঝাও যেমন কষ্টকর হবে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়নও হবে অগভীর।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির :

সময় উনিশ শতকের পাঁচের দশক। মাহিষ্য কুলোদ্ভবা রাণী রাসমণিদেবী দক্ষিণেশ্বরে বহু অর্থ ব্যয় করে কালীর নবরত্নসহ সুবৃহৎ মন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবালয় প্রভৃতি উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবং ৩১ মে ১৮৫৫ সালে ঐ মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হয়েছিল[৭]। অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মাঝে রাণীকে এ কাজ করতে হয়েছিল। যেহেতু তিনি শূদ্র জাতীয়া—সেই কারণে সমকালীন সমাজের ব্রাহ্মণকুল তাঁকে এ কাজে অনুমতি দিতে পারে নি। সেই ঘটনার নিখুঁত

বিবরণ দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দজী: "এখানেও (রাণী রাসমণি কর্তৃক মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার কার্যাদি) প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ঐ কালে প্রণামপর্যন্ত করিয়া ঐ মূর্তির মর্যাদা রক্ষা করিতেন না। এবং রাণীর গুরু বংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহারা শূদ্র মধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজন-যাজনক্ষম কোন ব্রাহ্মণই রাণীর দেবালয়ে পূজক পদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীকৃত হইলেন না।"[৮]। এমতাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভ্রাতা রামকুমার সমস্ত সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাণী রাসমণির মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করলেন। তার অনতিবিলম্বে আমরা লক্ষ্য করব তিনি কালীমন্দিরে পূজায় ব্রতী হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, পূজকপদে ব্রতী হওয়ার পরই তিনি বিবিধ দিব্যদর্শন পেতে থাকেন এবং তখন থেকেই পূজার কাজ ব্যাহত হতে থাকে। এরপর তাঁর দ্বাদশবর্ষকাল সাধনা এবং পূজা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এরপর নিবিড় জনসংযোগ এবং ক্রমশই তিনি কলকাতার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। গদাধর হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উত্তরণের পথ যে কী জটিল—ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ঝঞ্ঝায় পরিপ্লুত তা সমকালীন ইতিহাস ভাষ্যে উজ্জ্বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাজন্যবর্গ:

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতা ও মানুষের ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছিলেন। তিনি দেবতাকে 'প্রিয়' জ্ঞানে তাঁর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর তাই চেয়েছিলেন বলেই ঠাকুরকে রামপ্রসাদী গান শোনাতেন, তাঁর কাছে কাঁদতেন, রাত্রে ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথন করতেন, কখনো ঠাকুরের পায়ে ফুল দেবার আগে নিজের পায়েই ফুল রেখেছিলেন, ঠাকুরকে নৈবেদ্য অর্পণের আগে নিজেই তা উচ্ছিষ্ট করেছেন। তাঁর এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজকর্মচারীরা ভাল চোখে দেখেনি। প্রথম থেকেই তিনি রাজকর্মচারীদের মনমত হননি। রাজকর্মচারীদের ধারণা ছিল —'রাজপুরোহিত হবেন ধর্মীয় মোড়কে কূটনীতি, রাজকীয় চালে আড়ম্বরে পারিপাট্য'[৯]। বিনিময়ে তারা দেখেছিল রাজপুরোহিত—পৌরোহিত্যে বিমুখ, লোভহীন, অনাড়ম্বর এবং প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচারী। রাজানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় তাঁরা জমায়েত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ফাতোয়া জারি করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, "ছোট ভট্‌চায পাগল হয়েছে অথবা তাঁর মধ্যে উপদেবতা ভর করেছে, নতুবা পূজাকালে কেউ-ই কি অমন শাস্ত্র বিরুদ্ধে কাজ করে?"[১০] ঠাকুরবাড়ির প্রধান কর্মচারী খাঞ্জাঞ্চী মহাশয় ও অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ রাণী রাসমণি মথুরামোহনকে জানালেন: "ছোট ভট্‌চায (রামকৃষ্ণ) সব মাটি করলে; মা-র পূজা, ভোগরাগ কিছুই হচ্ছে না, ওরূপ অনাচার করলে মা কি কখনো পূজা ভোগ গ্রহণ করেন?"[১১] ঘটনা এখানেই শেষ নয়—রাণী রাসমণি শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে গান শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হলে তিনি

তাঁকে চপেটাঘাত করেন। তাই দেখে মন্দিরে কর্মচারী ও রাণীর পরিচারিকাবর্গ হই হই করে শ্রীরামকৃষ্ণকে অপমানের উদ্দেশ্যে তেড়ে আসে। কার্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাকালে তিনি রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে কোনরূপ সহযোগিতা তো পাননিই, বরঞ্চ প্রতিনিয়ত প্রতিহত, তিরস্কৃত ও অপবাদক্লিষ্ট হয়েছেন। তারা তাঁকে নির্বোধ ও উন্মাদজ্ঞান করত। এমনকি রাণীর জমিদারীর খাজাঞ্চীকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভয় করতেন। কলকাতার এক গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে তাদের উপাসনা দেখছিলেন কিন্তু ভেতরে ঢোকেননি, খাজাঞ্চীর ভয়ে। বলেছিলেন, "আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—ভাবলাম কি জানি যদি কালী ঘরে যেতে না দেয়।"[১২]

এ তো গেল রাজকর্মচারীদের কথা। স্বয়ং রাণীমা ও তাঁর জামাতা মথুরামোহনও কি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে সংশয়মুক্ত ছিলেন ? দক্ষিণেশ্বর থেকে কর্মচারীদের অভিযোগ জানবাজারে রাণীমার কাছে পৌঁছালে তাঁরা তার তদন্তে দক্ষিণেশ্বর এসেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য প্রদর্শন করলেও প্রথমপর্বে তাঁদের মানসিকতা সে মার্গে কখনোই ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া পরিপ্রেক্ষিতে মথুরামোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন : "ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়।"[১৩] এই মথুরবাবুই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করতে মূল্যবান ভোগ্যবস্তু উপহার দিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তিও তাঁর নামে লিখে দিতে চেয়েছিলেন এবং অবশেষে তাঁর ব্রহ্মচর্য বিনষ্টির উদ্যোগে বারবণিতাদের নিয়োগ করেছিলেন।[১৪] রাণী রাসমণিও তাঁর ব্রহ্মচর্য বিনষ্টির উদ্যোগে তাঁর ঘরে বারবণিতা পাঠিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ সমাজ :

সমকালীন ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও গুরুকুলের প্রতিনিধিরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম দেখাননি। সেক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা বিরুদ্ধাত্মক ও বিরূপাত্মক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনা প্রত্যয় থেকে ঘোষণা করেছিলেন, "ঈশ্বর সবেতেই আছেন তবে মানুষে তাঁর অধিক প্রকাশ"।[১৫] তাই মানুষকে অবমাননার পরিবর্তে শ্রদ্ধার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় ব্রতী হলেন। তিনি ব্রাহ্মণের বর্ণ চিহ্ন উপবীত ত্যাগ করলেন, আচার, পবিত্রতা-অপবিত্রতার বিচার বর্জন করলেন, কাঙালের এঁটো পাতা পরিষ্কার করলেন, অব্রাহ্মণের গৃহে খাদ্যগ্রহণ করলেন, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ধর্ম সাধনা করলেন এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন। তাঁর এই ক্রিয়া পারম্পর্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ মেনে নেয়নি। স্বামী সারদানন্দজী উল্লেখ করেছেন, "কিছুদিন ঐরূপ পূজা করিতে না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিদ্রূপভাজন হলেন।"[১৬] তাঁর খাদ্যাখাদ্যের এবং ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার ছিল না বলে নিজ স্বজনবর্গের কাছ থেকেও তাঁর নিগ্রহ কম ছিল না। তাঁরই উক্তি : "দেশে গেলুম, রামলালের বাপ (শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর) ভয় পেয়ে ভাবলে, যার তার বাড়িতে খাবে। ভয় পেলে পাছে তাদের জাতে বের করে দেয়। আমি তাই বেশীদিন (দেশে) থাকতে পারলুম না ; চলে এলুম।"[১৭]

সমকালীন ব্রাহ্মণদের মানসিকতা শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর কেমন ছিল মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনীতেও তা পরিস্ফুট: "পরমহংসমশাই রামদাদার বাড়িতে এইরূপ বার কতক আসা যাওয়া করাতে, পাড়ার লোকের তাঁহার প্রতি আর বিদ্বেষভাব কিছু রহিল না, কেহ উপহাসও করিত না।... পাড়ার মহেন্দ্র গোঁসাই আসিলেন কিন্তু কোন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিতেন না; ইহা আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পরমহংস মশাই ছিলেন মাড়েদের ঠাকুরবাড়ির পূজারী— মাহিষ্যদের পূজারী, তাহার উপর গলায় পইতা ছিল না। এইজন্য ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে রাজী ছিলেন না, আর এই কারণেই, ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরাও পরমহংসমশাইকে সেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না।"[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের সামাজিক বিন্যাস প্রসঙ্গে স্বামী সোমেশ্বরানন্দ জানিয়েছেন, "ভাটপাড়া, দক্ষিণেশ্বর ও কলকাতার হিন্দু ব্রাহ্মণেরা তাঁর কাছে বিশেষ যেতেন না, কারণ শূদ্রাণীর (রাণী রাসমণির) চাকরি করায় শ্রীরামকৃষ্ণ জাত হারিয়েছিলেন।"[১৯]

মথুরবাবুর কালীঘাটের পুরোহিত চন্দ্রহালদারের ব্যবহারের মধ্যেও সমকালীন ব্রাহ্মণদের মানসিকতার এক নজির দেখা যায়। "মথুরবাবু ক্রমশঃ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হওয়া কালে এক সময় রামকৃষ্ণ মথুরবাবুর জানবাজারের গৃহে হাজির হন। এবং সেখানে তিনি সমাধিস্থ হন। সে সময় তাঁর কাছে কেউ ছিল না। মথুরবাবুর পুরোহিত চন্দ্রহালদার সেখানে হাজির ছিল। তাঁর ধারণা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে কোন গুণটুন করেছে। ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থাতেই চন্দ্রহালদার বলতে শুরু করল, "অ বামুন, বল্ না বাবুটাকে কি করে হাত কর্‌লি? ঠাকুর সমাধিস্থ ও নিরুত্তর। হালদার পুরোহিত তখন ক্রুদ্ধ হয়ে 'যা শালা বল্লিনা' বলে তাঁকে লাথি মেরে চলে গেল।"[২০]

হিন্দু পুনরভ্যুত্থানকারী নেতৃবৃন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ:

শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনার সামাজিকীকরণের অধ্যায় হল উনিশ শতকের সাতের ও আটের দশক। তখন দেশ জুড়ে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের জোয়ার উত্তাল হয়েছে। অবশ্যই সে জোয়ার প্রাচীনকে অনুসরণে উদ্যত। সেই হিন্দু আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি। তিনি বৈদিক ধর্মের কোন কথা না বলে কেবল ভক্তিমূলক পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই তুলে ধরতেন তাঁর বক্তৃতায়। তিনি প্রচার করতেন, প্রাচীন প্রথা ও আচারগুলি। হাঁচি, টিকটিকি... নিয়মের ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতেন। টিকির চৌম্বক শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণ, হাই তুলে তুড়ি মারার মধ্যে অক্সিজেনের সম্পর্ক আবিষ্কার করে ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করতেন। অনেক সময় শাস্ত্রকে বিকৃত করে বা তার অংশ বিশেষ বর্জন করে তাতে বিজ্ঞানের রঙ লাগিয়ে সেই আচার-তত্ত্বকে ধর্ম বলে চালাতেন।"[২১]

যাই হোক কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শশধর তর্কচূড়ামণির সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি ভক্তিনম্রচিত্তেই নিবেদন করেছিলেন, "মহাশয়, দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাই আপনার নিকটে আসিয়াছি ভক্তিরস পাইব বলিয়া, অতএব আমি শুনি, আপনি কিছু বলুন।" শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর কাছে অত্যন্ত সৌজন্য দেখিয়েই বলেছিলেন, "ওগো তুমি পণ্ডিত, তুমি কিছু বল।"[২২]

এই আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শশধরের পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্পর্কও জ্ঞাত করায়; কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করার পর ঐ চূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্য পদ্মনাথ দেবশর্মা ১৩২৭ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকায় চূড়ামণি মহাশযের এক চিঠিকে ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর তীব্র কটাক্ষ হানেন। সেই চিঠির বক্তব্যে তিনি জানিয়েছেন, "রামকৃষ্ণ, 'পরমহংস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা জানিনা। খুব সম্ভব ইহা সাধারণ লোকের নিকট পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার গুরুই ঐ উপাধি দিয়া থাকেন, তবে তাহাও ভ্রান্তিমূলক বুঝিতে হইবে।... তাঁহাকে 'অবধূত আশ্রমী' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। আমি কোন ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ পাওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যাই নাই, কারণ তিনি কোন প্রকাব শাস্ত্রই জানিতেন না।"[২৩] শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভাব প্রসঙ্গে তিনি জানান, "সমাধির যে অসংখ্য স্তর আছে এবং যেগুলি করিতে পারিলে নির্বিকল্প সমাধি সম্ভবপর হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা জানা ছিল না। কারণ, লেখাপড়া তিনি আদৌ জানিতেন না।"[২৪] এইভাবে দীর্ঘপত্রে চূড়ামণি মহাশয কটাক্ষ হেনে গেছেন আগাগোড়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও খ্রিস্টান মিশনারিগণ:

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিক্রিয়াও অনুল্লেখের নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী পাঠক রেভাঃ কুক ও হেস্টি সাহেবের নামের সঙ্গে পরিচিত আছেন। ঘটনার বিবরণে তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের বিষয় উল্লিখিত থাকলেও প্রকৃত অর্থে তাঁদের ধর্মান্ধ মানসিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে গৃহীত হননি। এ মন্তব্য গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার সাফল্য ও মিশনারি প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বিভিন্ন নমুনায় তিনি এ মন্তব্য করেছেন।[২৫]

খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গের এ নমুনার কথা কথামৃতেও বিবৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র দত্তের কথোপকথনে এর ইঙ্গিত আছে। সমকালীন খ্রিস্টান পত্রিকা 'Indian Empire' বিশেষ দাপটের সঙ্গেই চালু ছিল। সেই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে রামচন্দ্র দত্তের বিশেষ আলাপ ছিল। রামচন্দ্র দত্ত সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালেন, "একজন খবরের কাগজের (Indian Empire) সম্পাদক আপনার নিন্দা করছিল।" প্রত্যুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তা করলেই বা।"[২৬]

পরবর্তীকালে ম্যাক্সমূলারের 'রামকৃষ্ণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হলে দেশব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া

শুরু হয় তাতে মিশনারি পত্রিকাগুলিও যোগ দিয়েছিল। অ্যাথীনিয়াম পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল: তিনি (রামকৃষ্ণ) বেদান্ত দর্শনের অনুগামী কিন্তু পণ্ডিত নন, সংস্কৃত বা ইংরাজী জানতেন না। বস্তুতঃপক্ষে তিনি নিছক এক গরিব ভিখারি, যিনি বাড়াবাড়ি কৃচ্ছ্রসাধন করে নিজের শরীর নষ্ট করেছিলেন।[২৭] হার্ভেস্ট ফিল্ড পত্রিকায় ই. ডবলিউ. টি., রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "রামকৃষ্ণের প্রেম, মনস্বিতা এবং বিবেকের দিক দিয়ে অভাবগ্রস্ত। তার ফলে তা বেহিসেবি এবং উন্মত্ত।"[২৮]

রেভাঃ মার্ডক যিনি অর্ধ শতাব্দিকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করেছেন এবং ক্রিশ্চান লিটারেচার সোসাইটির কর্ণধার হয়ে একাধিক পুস্তক রচনা করেছেন— যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মকে কদর্যরূপে প্রকাশ করা—সেই মার্ডক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানিয়েছেন, "বিবেকানন্দের গুরু শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু জানিতেন না—বিবেকানন্দ গুরুর উপরে মিথ্যা গুণারোপ করেছেন।"[২৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ:

উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে "ব্রাহ্মসমাজের" প্রভাব অপরিসীম। ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহনের দেহত্যাগের পর ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে তা হল 'ব্রাহ্মসমাজ'। ১৮৫৮ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং ঐ সমাজে সংস্কার আন্দোলনকে জোরদার করেন। এর ফলে প্রাচীনপন্থী ও নতুন পন্থীদের সংঘর্ষ বাধে। তার ফলে ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মসমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিভক্ত হয়। আদি সমাজের কর্ণধার থাকেন দেবেন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের কর্ণধার হন কেশবচন্দ্র। পরবর্তীকালে পুনরায় নব্য ও প্রাচীনদের সংঘর্ষ দেখা দিলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজে বিভক্ত হয় (১৮৭৮ সালে)। এই বিভাগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে থাকেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বে থাকেন কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্মসমাজের এই ধারাবাহিক বিবর্তনের পথে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বও স্মরণীয়। ঐ সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পরিচিতি ও প্রভাবের কথা ইতিহাসে বিবৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজস্ব আগ্রহেই ব্রাহ্মসমাজে হাজির হয়েছেন, তাদের নেতৃত্বে অধিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাদের প্রার্থনা সভাতেও হাজির থেকেছেন—তথাপি বিসংবাদ রহিত হয়নি।

অনেকেরই জানা আছে, প্রথম পর্বে মথুরবাবুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি মহর্ষিকে 'কলিরজনক' রূপে আখ্যাতও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পোষাক কৌলিন্য না থাকায় ব্রাহ্মউৎসবে যোগদানে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাতে যোগ দিতে পারেননি। কারণ মহর্ষি মথুরবাবুকে

জানিয়েছিলেন "শ্রীরামকৃষ্ণ যেন উৎসবে যোগদান না করেন, কারণ গায়ে উড়ানি থাকবে না, অসভ্যতা হবে।"[৩০]

এরপর ১৮৭৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটলে তাঁদের পারস্পরিক সৌহার্দ নিবিড় হয়। সেই নৈকট্য ব্রাহ্মসমাজ খুব আনন্দের সঙ্গে যে গ্রহণ করেনি লীলাপ্রসঙ্গে তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এ জাতীয় ঘটনার বিবরণ মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনীতেও বর্তমান : "গঙ্গার ঘাটে কেশববাবুর বক্তৃতা ; পরমহংস মশাইও বক্তৃতা শুনিতেছিলেন, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই তিনি বিরক্ত হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া যাইলেন। পরমহংস মশাইকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কেশববাবু ভাবিলেন যে তাহা হইলে বোধহয় বক্তৃতায় কোন ত্রুটি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য শ্রোতারা বলিতে লাগিলেন, "লোকটা অশিক্ষিত, মুক্‌খু, কোনো কিছু বোঝে না, তাই চলে গেল।"[৩১] ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, 'তাঁর ভাষা জঘন্য ধরনের নোংরা তিনি কুত্রাপি বৈদান্তিক নন ও তিনি স্ত্রীর প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহার করেছিলেন'।[৩২] পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হলে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন বন্ধ করেন। তিনি বলেছিলেন যে যদি তিনি ঘনঘন দক্ষিণেশ্বর গমন করেন তাহলে তাঁর দেখাদেখি অন্য সকলেও ঐরূপ করবে এবং দল ভেঙে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভাব প্রসঙ্গে তিনিই বলেছিলেন 'স্নায়বিক দৌর্বল্য' (hysteria or epileptic fits)।[৩৩]

ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাকক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম নিগ্রহের বিবরণও অনেকের জানা। নরেন্দ্রনাথের সন্ধান মানসে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনাকক্ষে হাজির হয়েছিলেন এবং তখন সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তাঁর সেই রূপ দর্শন অভিলাষে জনতা হুড়োহুড়ি করতে আরম্ভ করলে কর্তৃপক্ষ গ্যাসবাতিগুলি নিভিয়ে দেন। ফলে হুড়োহুড়ি ভয়ঙ্কর আকার নেয়। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর কাছেই হাজির ছিলেন। তাঁর সমাধি ভাঙলে তৎক্ষণাৎ সমাজগৃহের পিছনের দরজা দিয়ে তাঁকে বের করে আনেন। ঐ দিনের ঘটনায় তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে ঐ সমাজের আচার্য বা সমাজস্থ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠাকুরকে সাদর আহ্বান তো দূরের কথা, তাঁর প্রতি শিষ্টাচারও তাঁরা প্রদর্শন করেননি।"[৩৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব সমাজ :

সমকালে অন্যান্য ধর্মান্দোলনের সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজেও ধর্মান্দোলনের জোয়ার আসে। সমকালীন বৈষ্ণব চূড়ামণি, ভগবান দাস বাবাজী ও বৈষ্ণব চরণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বৈষ্ণব সমাজে। ঐ আন্দোলনের উপাদান হিসাবে হরিসভা, ভাগবত পাঠ, নাম সংকীর্তন, নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হতো দেশের ইতস্তত। এরূপ এক হরিসভা ও শ্রীরামকৃষ্ণ নিগ্রহের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় লীলাপ্রসঙ্গ হতে।

কলুটোলার হরিসভায় সভ্যগণ নিজেদের শ্রীচৈতন্যের একান্ত পদাশ্রিত মনে করতেন। এবং ঐ কথা অনুক্ষণ স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে হরিসভার আসরে একটি আসন ফুল ও মালা শোভিত রাখতেন। উদ্দেশ্য, ওটি 'শ্রীচৈতন্যের আসন' হিসাবে চিহ্নিত করা এবং ভক্তিভরে ভাবা যে ঐ আসনে শ্রীচৈতন্য সমাসীন এবং ভক্তগণ তাঁরই সম্মুখে ভাগবত কথকতা স্মরণ করছেন। ঐ আসরে বৈষ্ণব চরণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ব্রতী ছিলেন। এমতাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে হাজির হন এবং ভাবাবেগে শ্রীচৈতন্যাসনে দণ্ডায়মান হয়ে সমাধিস্থ হন। সমাধি ভাঙলে তিনি ঐ কীর্তন আসরে যোগদান করে সকলকে আনন্দাপ্লুত করেন।

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ আচরণ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করে। বিশেষ বৈষ্ণব ভক্তগণ ভাবলেন—নামযশঃ প্রার্থী ধূর্ত ভণ্ডেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে আর কখনো না আসন অধিকার করতে পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁরা বৈষ্ণব সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ ক্রিয়াকাণ্ডের সংবাদ পাঠালেন। এমন কি কালনায় বৈষ্ণবচূড়ামণি ভগবানদাস বাবাজীকেও ঐ সংবাদ জানালেন এবং ত্রুটি সংশোধনের পথ জানতে ব্যগ্র হলেন।

শ্রীচৈতন্য পদাশ্রিত সিদ্ধবাবাজী ঐ ঘটনা অবগত হয়ে বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ক্রোধান্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য কটুবাক্য তো প্রয়োগ করলেনই, সেই সঙ্গে তাঁকে ভণ্ড বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না।[৩৫]

যদিও পরবর্তীকালে ঐ ভগবানদাস বাবাজী শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে কৃতার্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর উপদেশ বাণীতে নিজেকে চিনতে পেরেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাধারণ লোকসমাজ:

সমকালে সাধারণের মানসিকতাও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। সাধনকালে তাঁর ভাবান্তর এবং প্রতিবেশী প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়: "অবশেষে তাঁর প্রার্থনা ও তাঁর ক্রন্দন এমন উচ্চকণ্ঠ হলো যে পাড়ার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা বিরক্তবোধ করলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে রাগে গজগজ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, "এ তো স্রেফ অত্যাচার। ঘুমোবার একটা সময় আছে। প্রার্থনার সময় নির্দিষ্ট। দেবীর বিশ্রামের সময় তাঁকে শয়ন না দিয়ে তাঁর সঙ্গে অনর্থক বকবক করা—এসব দুষ্কর্ম কোন সাম্মানিক পুরোহিত করে না। কিন্তু এসব কী!"[৩৬] শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ যোগানন্দের সামনেও জনৈক নৌকাযাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কটু বাক্য বলেছেন। যোগানন্দ দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে গহনার নৌকায় আসছিলেন। সে সংবাদ অবগত হয়ে জনৈক যাত্রী বলেছিলেন, "ঐ এক ঢং আর কি; ভাল খাচ্চেন, গদিতে শুচ্চেন, আর ধর্মের ভান করে যত সব স্কুলের ছেলের মাথা খাচ্ছেন।"[৩৭] এ জাতীয় উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ নিরঞ্জনের সামনেও করেছিল ঐ নৌকাযাত্রীবা।

এরপর সমকালীন ব্যক্তি মানসিকতা বোঝানোর উদ্যোগে স্বামীজী ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ

দত্তের লেখনী উল্লেখ করা যায়: "সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস নামে কে একজন লোক থাকে, তাহার মিরগি হয়, কিন্তু হাত-পা খেঁচা-খেঁচি করে না, আপনা-আপনি ভাল হয়, ডাক্তার দেখাইতে হয় না। ...আবার শুনা গেল যে, সে লোকটি রাসমণিদের পূজারী, কালীপূজা করিয়া থাকে। লোকটার নাম আবার 'পরমহংস', এ আবার কি কথা! লোকেরা অমনি ব্যঙ্গচ্ছলে পরমহংসকে 'গ্রেটগূস' (Great goosc) বলিতে লাগিল। পরমহংস মশাই-এর প্রতি তখনকার লোকের প্রথমে এরূপ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল।"[৩৮] সেই বিবরণে আরো প্রকাশ যে, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সিমলায় সুরেশমিত্তির-এর বাড়িতে গেলে তাঁর জনৈক আত্মীয় যিনি সরকারী উচ্চপদে বহাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সামনেই মন্তব্য করে বসলেন: "পরমহংস মশাই ছোট ছেলেগুলিকে বখাচ্ছেন, নষ্ট করছেন প্রভৃতি।"[৩৯]

উপসংহার:

আগের আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চালচিত্র হাজির করেছি। সেই ঘটনা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরিবেশ প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দাবীকেও নস্যাৎ করে। বিবৃত ঘটনার সমাহারে পাঠক নিশ্চিত অবগত আছেন, রাণী রাসমণির 'কালী সাধনা' শ্রীরামকৃষ্ণকে অপরাজেয় করেনি। সাধারণ মানুষের মত পদে পদে হোঁচট খেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে পৌঁছাতে হয়েছে জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, সংগ্রামে পূর্ণ—কোন মতেই কোন কিছুর সঙ্গে তিনি আপস করেননি। আঘাত অপমান নিগ্রহ কটুবাক্য সব কিছুই নীরবে হজম করেছেন। কেবল হেসেছেন।

বিস্ময় এই যে, রাজকর্মচারী, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মসমাজী, খ্রিস্টান মিশনারি, বৈষ্ণব সমাজী, সাধারণ মানুষ সকলের ঐ প্রতিক্রিয়া পরাভূত হয়ে 'ক্রমাগত জনতার স্রোত' তাঁকে আবর্তন করে ফিরত। ঐ প্রতিক্রিয়ার সংবাদ আপাত অপ্রীতিকর ঠেকলেও তার মধ্যে বিরাট সত্য নিহিত আছে। ঐ তীব্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ উনিশ শতকে ও বিশ শতকেও সর্বজনপূজ্য ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি কলকাতাকে জয় করেছিলেন। ঐ প্রতিক্রিয়াই তাকে বিজয়ী করেছে। অন্য শর্ত গৌণ। কার্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বজনগ্রাহ্যতা কোন ধর্মের নিগড়ে বাঁধা নেই। তিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর প্রজ্ঞায়—জ্ঞানে—চেতনায়—সমাজমনস্কতায়। তাই তাঁর জীবন যতখানি দেবত্বে—ততখানিই মানবত্বে মহিমান্বিত। অধ্যাপক রিবাকভের ভাষায় বলা যায়: "সবার উপরে রামকৃষ্ণ ছিলেন কবি।...আকাশে মেঘ দেখলে তাঁর ভাবোদয় হচ্ছে, প্রকৃতির শোভা দেখে তিনি আত্মহারা হচ্ছেন...তিনি সাধারণ মানুষের, আবার সাধারণ হয়েও অসাধারণ। তিনি ধুলো কাদা মাখা এই পৃথিবীরই মানুষ। লোকোত্তর হয়েও তিনি সকলের লোক।"

তথ্যসূত্র :

১. কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৪০১, পৃঃ ৪৯-৫৩
২. Hinduism through the Ages—D. S. Sarma, Bharatiya Vidya Bhavan, 1955, p. 125
৩. রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ ক্রিস্টোফার ইশারউড (অনুবাদ: রবিশেখর সেনগুপ্ত), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃঃ ১-২।
৪. উনিশ শতকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক— সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী, জি.এ.ই. পাবলিশার্স,কলকাতা, ১৩৮৮ পৃঃ ১-১৯
৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭২ বর্ষ, ১২৮ সংখ্যা
৬. উৎস মানুষ, জুন ও জুলাই সংখ্যা, ১৯৯১
৭. সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, জে. প্রি. প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ ৪
৮. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে (১ম খণ্ড, সাধকভাব)— স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৮, পৃঃ ৭৩
৯. শ্রীরামকৃষ্ণ: নৈঃশব্দের রূপ — ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ১৯৮৩, পৃঃ ১০
১০. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (১ম ভাগ), সাধক ভাব, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ১২২-২৩

বিচ্ছিন্নতা নিরসনে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা

"আমাদের ধানক্ষেতগুলো পাপিষ্ঠ খরায়
প্রতিদিন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে
অসংখ্য কৃষকের মৃতলাশ পড়ে আছে
দুর্ভাগ্যের বুনোঘাসে—নবান্নের বিদিশাবনে
... ...
সমুদ্র যাত্রার জন্য আমাদের কোন প্রস্তুতি নেই
আমরা কতকাল আর আমাদের লজ্জার সঙ্গীত গাইব ?"[১]
—এই হচ্ছে আধুনিক মনন। শতকের স্বাভাবিক জীবন।
প্রতি মুহূর্তেই জীবন দগ্ধ হচ্ছে আত্মহননের কারাগারে।
'নিমের পাতার মত নুয়ে গেছে হাত আর হাড়'....
'কমণ্ডুলু ভরে গেছে কার্তিকের হিমে, হাহাকারে'। বস্তুতঃ—

'আমাদের প্রতিদিন চুরি হয়ে যায় জমানো টাকার মত স্বপ্ন, সাধ, সম্ভাবনা, সৎ অভিপ্রায়।'[২] এইভাবে বিচ্ছিন্নতা আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী—কী ব্যক্তি জীবনে—কী পারিবারিক জীবনে—কী সমাজজীবনে—সর্বত্রই একই চেহারা। এই বিচ্ছিন্নতা যেমন সামাজিক বিশৃঙ্খলতার বিশেষ উৎস তেমনি মানবিক বৈকল্যের এক অনিবার্য শর্ত। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার প্রকৃতি ও উৎস অন্বেষণ আর সেই বিচ্ছিন্নতা নিরসনে শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাচেতনার প্রায়োগিক তাৎপর্য দর্শানো।

বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ

ব্যক্তি জীবনের দিকে একবার তাকালে দেখা যাবে বিবর্ণ পাণ্ডুর বিচ্ছিন্নতার ঘন মেঘ সেখানে জমা হয়ে আছে দীর্ঘদিন। সমাজবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের পরিসংখ্যানের কথা বাদ দিলেও দৈনিক সংবাদপত্রে চোখ বোলালেই আমরা দেখতে পাই বিচিত্র মানসিক বিকৃতির নমুনা। অ্যানোমি (নিঃসঙ্গতা), ইব্‌টিজিং, প্রতিহিংসা, খুন, মস্তানি, চোরাচালান, মাদকাসক্তি ও আত্মহননের হার ক্রমবর্দ্ধমান।[৩] সাম্প্রতিক গণনায় দেখা গেছে এরাজ্যে নিজের হাতে যত লোক মরে তার এক-দশমাংশ অন্যের হাতে মারা যায়।[৪] যুবসমাজকৃত ডাকাতি, খুন ও ধর্ষণের হারও বাড়তির মুখে। গত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে সর্বস্তরে মাদকাসক্তের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। কেবল বোম্বাই শহরেই একলক্ষ তরুণ মাদকের শিকার।[৫] তাছাড়া দুর্নীতি, নীতিভ্রষ্টতা,

মিথ্যাচার, স্বজনপোষণ, অন্যায় ও অবিচারে যুব সম্প্রদায় জর্জরিত। এ ব্যাপারে চিন্তিত নেতৃবৃন্দ, সমাজতত্ত্ববিদ্গণ ও মনোবিদগণ। এক শ্রেণীর যুবসম্প্রদায় আজ সমাজ মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ছন্নছাড়া' কবিতায় তাদিকে 'নেই রাজ্যের বাসিন্দে' আখ্যা দিয়ে যথার্থই যুগের অবক্ষয়, যন্ত্রণা ও বিচ্ছিন্নতাকে মুদ্রিত করেছেন।

সংসার বা পারিবারিক জীবনেও বিচ্ছিন্নতার প্রবহমানতা সুস্পষ্ট। যৌথ গৃহের ভাঙ্গন (family disorganisation), বিবাহ বিচ্ছেদ (divorce) ও তরুণ দুষ্ক্রিয়তা (juvenile delinquency) আজকের মুখ্য পারিবারিক সমস্যা। যৌথ পরিবার ক্রমশ ভাঙ্গনের মুখে। সেই জায়গায় শহরে দম্পতিকেন্দ্রিক বা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে উঠছে। এবং দম্পতিকেন্দ্রিক ছোট্ট পরিবারে অনধিক এক সন্তান-সন্ততি গ্রহণ প্রবণতাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তাতেও সংসার সুখ-শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারেনি। অনিচ্ছাকৃত বা আকস্মিক উৎপাতের মত দম্পতি জীবনে প্রেম-ভালবাসার যবনিকা টেনে বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠছে। জীবনে শান্তির ক্ষেত্রে 'বিবাহ বিচ্ছেদের' ভূমিকা যদিও তর্কের বিষয়, তবু খুব জোরের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, 'বিবাহ বিচ্ছেদ' সংশ্লিষ্ট সমুদয় ঘটনাই দম্পতি প্রজন্মের অভিশাপ ব্যতীত কিছুই নয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে সন্তান-সন্ততি যেমন গৃহ বিতাড়িত বাধ্যতামূলক সমাজ-আগাছায় পরিণত হয়—বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাক্কালে পিতা-মাতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ অনুরূপ শিশুর মানসিক ভারসাম্য হারানোর অনুকূল শর্ত।[৬] উক্ত সমস্যার সঙ্গে তরুণ-দুষ্ক্রিয়তাও আজ সমান তালে বেড়ে উঠছে অপ্রতিহত গতিতে, প্রতি পরিবারই এই সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। শিশুর বেড়ে ওঠার পথে রুশো কথিত সুস্থ পরিবেশের সরবরাহ অনেক পরিবারের পক্ষেই সম্ভব হয় না—তার ওপর ভারতের মতো সমস্যাসঙ্কুল দেশে—এ কথা ভাবাই অবান্তর। এর ওপর জীবিকার তাগিদে অনেক অভিভাবকদেরই শিশুসন্তানদের অন্যের দায়িত্বে রেখে চাকরিতে বেরুতে হয়। সন্তান-সন্ততির শরীর পরিচর্যারই যখন সময়ের অভাব তখন তার মানসিক স্বাস্থ্য লক্ষ্য রাখার সময় কোথায়? অথচ পিতা-মাতা সব সময়ই তাঁদের পুত্র-কন্যাদের নিয়ে স্বপ্নময় ভবিষ্যতের জাল বোনেন। একদিকে পরম প্রত্যাশা—অন্যদিকে অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতা—এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে একাধিক সামাজিক পরিবর্তনীয় প্রভাবকের ভাণ্ডার। ফলে কিশোর মন ভারসাম্য রাখতে অপারগ হয়। তাদের মনে জেগে ওঠে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। তখনই তারা বিচিত্র দুষ্ক্রিয়তার শিকার হয়—যা অভিভাবকদের যন্ত্রণার কারণ।

সমাজজীবনকেও বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রতিদিন। সন্ত্রাস, লুঠতরাজ, দুর্নীতি, গণধর্ষণ, গণহত্যা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মোন্মত্ততা ও উগ্রজাতীয়তাবাদের কবলে পড়তে হচ্ছে অসংখ্য মানুষকে।[৭] সুস্থ সমাজ হয়ে উঠেছে অসহিষ্ণু। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও বিপন্ন। অসংখ্য নির্বিবাদী মানুষ তার শিকার। বিগত কয়েক বছরের খালিস্তানী ও গোর্খা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী

গণহত্যার নমুনা নতুন করে বিবরণের অপেক্ষা রাখে না। দুর্নীতির কথাও আজকের সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা। আন্তর্জাতিক সমাজতত্ত্ববিদ্ গুণার মির্ডাল তো মন্তব্যই করেছেন—'ভারতের উন্নতির প্রধান অন্তরায় ব্যাপক দুর্নীতির প্রসার'। ধর্মীয় মতান্ধতায় ও সহ্যশক্তির অভাবে স্থানে স্থানে সংগঠিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—যা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন বর্ণের ও জাতের ব্যক্তিদের মধ্যে এখনো বর্ণবৈষম্য ও জাতপাতের লড়াই চলছে। সেই সঙ্গে চলছে ধর্মের নামে অন্ধ-অনুশাসনের নিরবচ্ছিন্ন অবৈজ্ঞানিক চর্চা ও অত্যাচার।

বিচ্ছিন্নতার উৎস:

বিচ্ছিন্নতা আজকের সমাজে বিশেষ সমস্যা। ব্যক্তি, গৃহ, সমাজ ও দেশ এব আক্রমণে দুষ্ট। কোন নির্দিষ্ট কারণকে এই ঘটনার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। তবে সকল সমাজতত্ত্ববিদই একে অসংগঠিত বা 'Cultural lag' বলে চিহ্নিত করেছেন। পূর্বতন সমাজব্যবস্থা বদলেছে—বিজ্ঞান ও আধুনিকতার দৌলতে নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সমাজ পুষ্ট। যে হারে সমাজ দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে সেই হারে সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে অনিবার্য দ্বন্দ্বের সামনে পড়তে হচ্ছে ব্যক্তিকে, তার পরিবারকে ও সমাজকে। অধুনার এক সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায়—বাম ও ডান উভয় গোষ্ঠীই শিক্ষাবিদ্, সংস্কৃতিবিদ্ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এক জোটেই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিরসনের জন্য নতুনতর মূল্যবোধ উন্মেষের কথা বলেছেন? যদিও মূল্যবোধ জাগরণের সঠিক সড়ক কেউই নির্ধারণ করতে পারেন নি। কোন কোন গবেষক মূল্যবোধের সংকটের পিছনে অর্থনৈতিক কারণকে অতি গুরুত্ব দিলেও—সামগ্রিকভাবে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক শর্তের ভূমিকাই সর্বজন স্বীকৃত।[৮] ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ আলোচনায় ব্যক্ত যুবসমাজের অবক্ষয়, মাদকাসক্তির ও আত্মহত্যার পিছনে নিঃসঙ্গতা অবশ্যই কার্যকরী ঘটনা। কর্মসংস্থান, বেকারীত্ব, উপযুক্ত কর্ম সংস্থাপনের অভাব, দারিদ্র্য, বিদ্বেষ, হতাশার সৃষ্টি করে। তারই বশবর্তী হয়ে যুবসমাজ—বিশৃংখল হয় ও উল্লিখিত বৈকল্যের শিকার হয়। কিন্তু মাদকাসক্তির ও আত্মহত্যার কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক সংকটই সব সময় কার্যকরী নয়। প্রেমে ব্যর্থতা, পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য না হওয়া ও দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য লোক আত্মহত্যা বেছে নেয়। আমাদের দেশে এ জাতীয় ঘটনার নমুনাই বেশী। আধুনিক সমাজব্যবস্থার পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সহানুভূতির (Social Sanction)[৯] অভাব যুবসমাজকে ধৈর্যহীন ও সংহতিচ্যুত করে তুলছে বলে অনেক মনোবিদ্ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মনোবিদ্ কুহ্ন (১৯৬৬)-এর মন্তব্য স্মরণীয়—"It (social disorganization and deviant behaviour) arises when the participants are not motivated, when their values, interest and aims are

not integrated with the requirements for continuity of the interacting system."[১০]

পরিবারগত বিচ্ছিন্নতার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ গৌণ। সমাজতত্ত্ববিদ্ পারসনের (১৯৬৪) বিবৃত গবেষণালব্ধ প্রত্যয় খুবই প্রাসঙ্গিক 'Economic motivation is not a Category on the deeper level at all.'[১১] ভারতে বিচ্ছিন্নতায় শিল্পায়ন ও নগরায়নের বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, দায়িত্বভার লঘুকরণ, দুশ্চিন্তার নিরসন, ভৌগোলিক-সচলতা-উপভোগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার প্রলোভনেই দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার অধিকতর জনপ্রিয়তা পেয়েছে।[১২] এ জাতীয় পরিবর্তনের এক যুক্তিগ্রাহ্য উপহার হল বিজ্ঞানী অলভিন টফ্লার প্রণীত 'Future Shock'। লেখক সেখানে উল্লেখ করেছেন, 'অধিশিল্পায়নের (Super industrialization) তাগিদে মানুষ ছাঁটাই নীতির (sreamlined) পদ্ধতিতে নিউক্লিয়ার পরিবার গঠন করে। কারণ শিল্পায়ন সমাজে ভৌগোলিক সচলতা অক্ষুণ্ণ রাখতেই এই পরিবর্তন অনিবার্য।' সেই সঙ্গে তিনি এক ভবিষ্যৎ কল্পনার চিত্র এঁকেছেন, 'আশা করা যায় আগামী দিনে অধিশিল্পায়নের ব্যাপকতা ও গতিময়তার দরুণ হয়তো দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারকেও ছাঁটাই করতে হবে। তখন দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার সন্তান-সন্ততিবিহীন দম্পতি সর্বস্ব পরিবারে পরিণত হবে।'[১৩] এ জাতীয় প্রত্যয়ের সমর্থন পাওয়া যায় আর এক আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রে। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে থোমাস ও জ্যানিকি (Thomas and Znaniecki, 1927) জানিয়েছেন, 'ভোগবাদী চেতনার সারবত্তাই এজাতীয় পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক।'[১৪] আমাদের সমাজের শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা (অধিকাংশ পরিবারে একাধিক অপত্য কাম্য নহে) দেখলেই এ জাতীয় বক্তব্যের সত্যতা মিলবে। বিবাহ্ বিচ্ছেদের বিবিধ কারণ পর্যালোচনা করলে মুখ্যত দেখা যাবে সেই 'Ledonistic Satisfaction'-এর কবলে পড়েছেন হয় স্বামী নয়তো স্ত্রী। যদিও অন্যান্য আনুষঙ্গিক শর্ত অস্বীকার করার নয়। তবু এই শর্তকেই প্রাধান্য দিতে হবে কারণ এ জাতীয় উত্তেজনায় প্রক্ষোভ শাসনাধীন যুক্তিবাদ, নীতিজ্ঞান, ধৈর্য ও সামঞ্জস্য বিধান ক্ষমতা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে না।[১৫] এই বক্তব্য পুনরায় জ্ঞাত করায় শিশুর পিতামাতার আবশ্যিক পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যার অবহেলা বা পৌনঃপুনিক সময় ব্যয়ের অসমর্থতা—যার অনিবার্য পরিণতি অধুনার তরুণ দুষ্ক্রিয়তা (Juvenile delinquency)। কার্যত সামাজিকীকরণের ব্যর্থতাই তরুণ দুষ্ক্রিয়তার কারণ। এ প্রসঙ্গে লা-পেয়ার ও ফার্নসওয়ার্থ, অভিভাবক কুলের নিষ্ক্রিয়তাকেই অভিযুক্ত করেছেন।[১৬] বৈজ্ঞানিকদ্বয় আরো উল্লেখ করেছেন, 'পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গ শিশু আচরণ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference group) এবং শিশুর আচরণের সামঞ্জস্যবিধান ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তার আত্তীকরণ ঘটানোর দায়িত্বও তাদের।' সম মত দর্শান বিজ্ঞানী বাণ্ডুরা ও ওয়ালটার[১৭] (১৯৫৯) Lack of parental affection or rejection or indeference

may affect the development of internalized standards of control. ভারতের সমাজগত বৈকল্যের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন সভা সমিতি ও দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনমুখী যে সমাবেশ হয়, তা সমাজে ভীতি বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে না। কিন্তু উদ্দম ও উদ্ধত যে মব (mob)—যা সমাজ-মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন—যার জন্য গোষ্ঠীজীবন বিপন্নতা বোধ করে তাই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিপাদ্য। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়—উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসূত গণহত্যার প্রবাহ, ধর্মীয় মতবিরোধ, সংশ্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বর্ণবৈষম্যের জিগিরধারী শোষণ ও পীড়ন—এমন অনেক। এ জাতীয় গণ-অসন্তোষ সমাজ মানসিকতাকে বিভ্রান্ত করলেও তাদের উৎসমুখে নিশ্চয় কোন যুক্তিগ্রাহ্য শর্ত ছিল। হয়তো অনুসন্ধানে এ জাতীয় উন্মাদনার পিছনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা সামাজিক নিরাপত্তা বা সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা বা নানা যুক্তিগ্রাহ্য কারণের সন্ধান বিলবে।[১৮] তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, আন্দোলনকারিগণ যখন কেবল গণহত্যা লুঠতরাজ ও ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়, তখন সেখানে যুক্তি থাকে না—নীতিবিজ্ঞান বিবর্জিত হয় এবং আবেগই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে।[১৯] বস্তুতঃ কোন সামাজিক আন্দোলন তখনই সফল হয় যখন তার বিস্তার ও বিকাশ সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের মনে সান্ত্বনা ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।[২০]

বিচ্ছিন্নতা নিরসনে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রাসঙ্গিকতা :

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তে লক্ষ্য করা গেছে, আজকের নৈরাশ্যবোধের মুখ্য কারণ পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যক্তির উপযুক্ত সামাজিকীকরণের বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী যেমন ব্যক্তি নিজে, সেই রকম দায়ী ব্যক্তির পরিবার, সমাজ ও দেশীয় নেতৃত্ব। অসংখ্য শর্তের মিথোস্ক্রিয়ায় ব্যক্তির উপযুক্ত সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয়। আমরা এখানে মুখ্য দশটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব (সমাজতত্ত্ববিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তনুগ অবশ্যই)—যার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণশিক্ষার যথার্থই প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান এবং সেখান থেকে এই বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের এক বিজ্ঞানসম্মত মডেল রচনা করা সম্ভব হবে।

প্রথম শর্ত **কর্মযোগে আস্থাবান হওয়া।** অনেকেই মনে করেন, বেকারত্ব আজকের বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যয়ে সে সমস্যা নিরসনের দিকদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, 'কর্মমাত্রেই ভগবানের পূজা জেনে, তাঁর প্রীতির জন্যে যে কর্মানুষ্ঠান করে, সে মুক্ত।'[২১] জীবনে চাকরী ব্যতীত অন্যান্য কর্মকাণ্ডের (স্বাধীন ব্যবসা, কৃষিকার্য প্রভৃতি) প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং ব্যক্তিমানসকে তার মধ্যে নিয়োগ করার নির্দেশ তাঁর উক্তির মধ্যেই নিহিত। কেরানীগিরির মোহের প্রতি তাঁর ধিক্কারবাণী আমাদের জানা, 'পরের কর্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছো। আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরী স্বীকার করে তাদের বুট জুতার গোঁতা দু'বেলা খায়।'[২২] চাকরীর মোহগ্রস্ততাকে তিনি দাসত্ব বলেই মনে

করতেন। তাই ঘৃণাভরে বলেছেন, 'একদিকে মাগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর একদিকে মনিবের দাস, তাদের চাকরী করতে হয়।'[২৩] তার প্রত্যয় স্বামীজী কণ্ঠেও বিধৃত হয়েছিল। 'ভারতীয়রা ব্যবসা করা শুরু করুক, চাকরীর পিছনে না ছুটে।'[২৪] জীবনকে কর্মব্যস্ত রাখার নির্দেশ খুবই যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত—কারণ যে কোন কর্মোদ্যোগে আগে অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতাই অভিলক্ষ্য অনুযায়ী কর্মসম্ভাবনার সুযোগ করে দেয়। তাই সকল বৃত্তিকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। তাঁর কণ্ঠেরই স্বতঃস্ফূর্ত নির্দেশনামা : 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর।'[২৫]

দ্বিতীয় শর্ত **যুক্তিবাদী শিক্ষা গ্রহণ প্রবণতা**। তাবৎ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলার মোক্ষম অস্ত্র বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষা গ্রহণ। শিক্ষার প্রতি এই বিশেষ নজর সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি। তিনি বলেছিলেন, 'অন্নের চেয়ে জ্ঞানদান বড়।'[২৭] কালের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আগ্রহ ছিল বেশী। তিনি নিজে যেমন ছিলেন যুক্তিবাদী, সেই রকম অন্যকেও নির্দেশ দিতেন, 'ভাল মন্দ বিচার করে কোন জিনিস গ্রহণ করতে।' কথায় বিশ্বাস করে কিছু মেনে লওয়াকে বলতেন 'কপটতা।'[২৮] তাঁর যুক্তিবাদের শিক্ষাই ঊনিশ শতকের ধর্মীয় পুনরুত্থানের কালেও তাঁকে কেউ এতটুকু নিয়মের দাস করতে পারেনি। প্রত্যয় সিদ্ধ বিপ্লবীর মতই তাঁর কণ্ঠে সেদিন গর্জে উঠেছিল—'কলিতে বেদমত চলে না,[২৯] 'সিদ্ধাই' হীন বুদ্ধির নামান্তর,[৩০] এবং 'শুচি-অশুচি বিচার' 'জ্ঞানের লক্ষণ নয়'[৩১]। আমাদের আরো বিস্মৃত হতে হয় যখন দেখি তিনি ঈশানকে বলেছেন, 'কোশাকুশি ছুঁড়ে দাও'[৩২] অথবা রাখালকে বলেছেন, 'বেশী বিচার করবি না।'[৩৩]

তৃতীয় শর্ত হিসাবে অবতারণা করা যায় **মননচর্চা ও প্রক্ষোভ পরিপোষণ**। মন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'মন ধোপার ঘরের কাপড়—মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙেই ছাপবে'।[৩৪] মনকে ধনাত্মক প্রক্ষোভে অভিযোজিত করার জন্যই তিনি বলেছেন, 'সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।'[৩৫] তিনি আরো বিশ্বাস করেন, সত্য ও সারল্য চৈতন্য লাভের আবশ্যিক শর্ত। আধুনিক মনোবিদ সিবল্‌ম
মানুষের বৈকল্য ও মানসিক সাম্যে যথাক্রমে নঞর্থক ও সদর্থক প্রক্ষোভের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন।[৩৬] এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণ উক্তিরই প্রতিধ্বনি, মানুষ মনেতেই মুক্ত—মনেতেই বদ্ধ'[৩৭]। অর্থাৎ মনের নিয়ন্ত্রণে সে সামাজিক মানুষ হতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ হীনতায় সে বন্যও হতে পারে। মনকে সঠিক পথে সঞ্চারিত করে (সদর্থক প্রক্ষোভ পরিপোষণ মাধ্যমে) প্রেম ভালবাসায় উজ্জীবিত করার অক্লান্ত কর্মী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ধনী-দরিদ্র, চাকরীজীবী-ব্যবসায়ী, সাধু-বেশ্যা, ভাল-মন্দ বিচিত্রবর্গের ব্যক্তিকে কোনরূপ যাচাই বাছাই না করে আকুল হয়ে ভালবাসতেন এবং এ হেন ভালবাসার উপযোগী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি শতকের একক ব্যক্তি যিনি ভালবাসাকে সংহতির চূড়ান্ত শর্ত হিসাবে পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'He is love personified' (মূর্তিমান প্রেম)[৩৮] তিনি সমাজের সমস্ত বৃত্তির প্রতিনিধিদের সমান শ্রদ্ধা দিতেন। তিনি যেমন ব্যাকুল হতেন পণ্ডিত কেশব সেনের জন্য তেমনই ব্যথিত হতেন নৌকার মাঝিদের কষ্টে। তাই তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল 'কারও নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও না।'[৩৯] আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানিগণও ভাবছেন, প্রেম, ভালবাসা, দয়া, মায়া ইত্যাদি মনন ক্রিয়া দ্বারা নঞর্থক প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিকে সামাজিক করে গড়ে তোলা সম্ভব।'[৪০] আমাদের বিস্ময়, মনোবিদ না হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ বহু আগেই নির্দেশ দিয়েছেন উন্নত মানসিক মার্গ তৈরির জন্য 'সাধন' আবশ্যক। 'জ্ঞান', 'ভক্তি',[৪১] ও 'দয়ার'[৪২] নিয়ত পরিচর্যা মানুষকে 'জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়'[৪৩] করে তুলতে পারে। তাই নির্দ্বিধায় বলেছেন—'দয়া যার নাই সে মানুষই নয়'[৪৪] তিনি 'দয়া'কে আরো ব্যাখ্যা করে আমাদের জানিয়েছেন, 'দয়া মানে সর্বভূতে ভালবাসা'। এই ভালবাসা শ্রীরামকৃষ্ণশিক্ষার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

চতুর্থ শর্ত **ব্যক্তিত্বের বিকাশ**। ব্যক্তিত্ব সামাজিকীকরণের সামগ্রিক ফল—বলেছেন লা পেয়ার ও ফার্ণসওয়ার্থ। অহং বোধের (self ego) মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব ও তদুপযোগী মানসিকতার বিকাশ হয়। ব্যক্তিত্ব সামাজিক নীতি বা ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিকে সমঝোতা করতে ও নবতর মূল্যবোধের সাঙ্গীকরণে সাহায্য করে। এর ফলে উদ্দেশ্য দৃঢ় হয় এবং নির্ধারিত দিকে তা চালিত হতে পারে। ব্যক্তিত্ব যুক্ত এই আমিত্বকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিদ্যার আমি'[৪৫] বা 'পাকা আমি'[৪৬] বা কখনো 'পূর্ণজ্ঞানী'[৪৭] বলে চিহ্নিত করেছেন। এ জাতীয় প্রত্যয়ের লক্ষণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন, 'প্রথম অভিমান থাকবে না, দ্বিতীয় শান্ত স্বভাব।'[৪৮] ব্যক্তির স্বরূপ বোঝাতে তিনি যে উপমার উপস্থাপন ঘটিয়েছেন তা বড়ই রোমাঞ্চকর: 'জ্ঞানীর (ব্যক্তিত্বযুক্ত প্রকৃতির) বিচার থাকে না। যতক্ষণ কাঁচা ঘি ততক্ষণই কলকলানি শব্দ। পাকা হলে আর শব্দ থাকে না।'[৪৯] তিনি প্রকৃত ব্যক্তিত্বযুক্ত প্রকৃতিকে বোঝাতে চাইতেন নিন্দা, ঘৃণা ও ভয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থিত চেতনা যা 'সর্বজন হিতায় ও সর্বজন সুখায়' নিয়োজিত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পঞ্চম শর্ত **ধৈর্যাভ্যাস ও সামঞ্জস্য বিধান ক্ষমতা**। এ জাতীয় প্রকৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ সহায়ক। স্বামীজী বলতেন, 'অপ্রতিকারই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার।'[৫০] সমাজজীবনে ধৈর্যের অভাবজনিত ক্ষতিকারক প্রক্ষোভ প্রকৃতি আমাদের চোখে পড়ে। ধৈর্যের অভাবে কোন ঘটনার বা তথ্যের অনুসন্ধিৎসামূলক বিশ্লেষণ হয় না। এর ফলেই গড়ে ওঠে ভুল বোঝাবুঝি। সেই জায়গায় ক্রোধ ও হিংসা করে নেয় স্থায়ী আশ্রয়। তারই সম্ভাব্য পরিণতি হয় প্রতিশোধ আত্মহননের ইচ্ছা। সমাজজীবনে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসংবাদে, গৃহ ভাঙ্গনে বা বিবাহ বিচ্ছেদে। অথচ ধৈর্য ধরে তাৎক্ষণিক বিচারে সিদ্ধান্ত না নিয়ে একটু বিশ্লেষণের সুযোগ নিলে হয়তো চরম বিপর্যয় কারো জীবনেই নেবে আসবে না। সিদ্ধান্তও হবে নিয়মানুগ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 'ধৈর্য'কে সৃষ্টিমূলক এবং 'ধৈর্যহীনতা'-কে ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে আমাদের নতুন করে গড়ে

ওঠার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ষষ্ঠ শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করা যায় **উদারতা ও ঔদার্য**। জীবনে কোন জিনিসকেই অভ্রান্ত বলার মত নির্বুদ্ধিতা কিছু নেই। কোন জিনিসই চরম নয়। এ বিজ্ঞানের প্রত্যয়। গত দিনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরবর্তীকালে নবতর যুক্তি ও ব্যাখ্যার জোরে বাতিল হওয়া বিজ্ঞানের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এমতাবস্থায়, কোন রাজনৈতিক দল বা ধর্ম সম্প্রদায়ের সমর্থকগণ যখন তাদের মতাদর্শকে 'অভ্রান্ত' বলে মনে করেন তখন সেটা আত্মপ্ররোচনারই নামান্তর হয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী লেখক অশোক রুদ্রের লেখনীর কয়েকটি লাইন স্মরণ করতে পারি—"ভ্রান্তি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অপরিহার্য অঙ্গ। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত মন মার্ক্সবাদকে গুরুবাদের ভাবাবেগ দিয়ে গ্রহণ করেছে। ফলে সমাজ, সমালোচনা বিষয়টা কী মার্কসবাদী, কী মার্কসবাদ বিরোধী বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে সমপরিণামে অনুন্নত থেকে গিয়েছে।"[৫১] এ জাতীয় বুদ্ধির একদেশদর্শীতাই সমাজে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংঘর্ষের কারণ হয়। অথচ প্রত্যেক মতই নির্দিষ্ট আদর্শের ধারক ও বাহক এবং প্রত্যেক মতই সামগ্রিক অর্থে সমাজ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ। অথচ আচরণগত ভিন্নতার সূত্র ধরে প্রবহবান কলহ, সংঘাত (সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় যা 'দ্বন্দ্ব' বলে চিহ্নিত) সামাজিকীকরণের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। এই সমস্যা উত্তীরণের স্বপ্ন দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, 'একই বস্তু—নাম ভেদ মাত্র।'[৫২] 'আমার ধর্ম ও আদর্শ ঠিক এবং অপরের মত ভুল'—এ জাতীয় ধারণাকে 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলে চিহ্নিত করেছেন। এবং এও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'এ মত চলে না।'[৫৩] তিনি মনে করেন অহং জ্ঞান ও অজ্ঞান চেতনা থেকেই এ জাতীয় প্রত্যয়ের উদ্ভব অর্থাৎ অনুসৃত মতবাদের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির অভাব থেকেই এ ভ্রান্তির সৃষ্টি। তিনি জীবন দিয়ে এই সত্যের তাৎপর্য রেখে গেছেন আমাদের সামনে। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধক হয়েও সমান শ্রদ্ধার খ্রিস্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের অনুশীলন করেছিলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস, 'যে সমন্বয় ক'রেছে, সেই-ই লোক।'[৫৪] সমস্ত ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি যে ধর্মের 'গণতন্ত্রীকরণ' দেখিয়েছেন তা বিশ্বের বিস্ময়। কেবল সাম্প্রদায়িক বিভেদেই নয়—'মার্কসীয় সাম্যবাদ যে ধনী-দরিদ্র, শোষক শোষিত প্রভৃতি ভেদরেখা বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বে সেই গণ্ডিও বিলুপ্ত।' সাহিত্যিক আনন্দ বাগচী উল্লিখিত এই তথ্য অবতারণায় মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের এই অন্তর্বর্তী সাম্যবাদই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শেষ কথা।'[৫৫] বস্তুত তাঁর জীবন ও উপদেশ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত জীবনকে 'মতুয়ার বুদ্ধি' বর্জন করে উদারতার অভ্যাস বা flexibility চর্চার প্রেরণা যোগায়।

দায়িত্ববোধ (সপ্তম শর্ত) সামাজিকীকরণের অপরিহার্য অঙ্গ। দায়িত্ব পালন যেমন ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দেয়—সমাজজীবনকেও সেরূপ সুশৃঙ্খল করে তোলে। এর ব্যত্যয় হলেই ঘটে একাধিক বিপত্তি। দায়িত্ব পালনের অর্থ হল প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান হওয়া—'মন ও মুখ এক করা।'[৫৬] কী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, কী সরকারী

চাকরীতে—কী ধর্মীয় নেতৃত্বে—কী রাজনৈতিক পরিচালনায় সবক্ষেত্রেই নিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। দুর্নীতি জর্জর আজকের সমাজব্যবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের সতর্কবাণী বড়ই প্রাসঙ্গিক—'যারা বিষয় কর্ম করে—অফিসের কাজ—কি ব্যবসা করে—তাদের সত্যতে থাকা উচিত।'[৫৭] সংসারে সকলে উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করলে সাংসারিক শৃংখলতা বজায় থাকে। পিতামাতার উপযুক্ত দায়িত্ববোধ কৈশোর দুষ্ক্রিয়তার প্রতিরোধক বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত।[৫৮] একই সুর ঝংকৃত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ উপমার—'যখন চারা গাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।'[৫৯] বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী পিয়াজে দেখেছিলেন যে, 'চোদ্দ পনের বছর বয়স থেকে মানুষের বোধগম্যতার মাত্রা গভীরতা পেতে থাকে বা প্রথমে একটা কাঠামো তৈরি হয় যা ক্রমশ চারপাশে ঘটতে থাকা ঘটনাবলীর কার্যকারণ ও নৈতিকতার উৎস অনুসন্ধান করে ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। যে কোন মানুষের বেলাতেই শৈশব অবস্থা থেকে এ কাঠামো তৈরি হওয়া দরকার নইলে সে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়।[৬০] কাজেই দায়িত্ববোধের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের যে তীক্ষ্ণ নির্দেশ তা বড়ই ব্যবহারিক।

মূল্যবোধ বা চৈতন্য জাগরণ সামাজিকীকরণের (অষ্টম শর্ত) আর এক আবশ্যকীয়। এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ব্যক্তি চেতনার 'চৈতন্যবোধ' না থাকলে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে ঘটে বিলয় তেমনি তার সামাজিকীকরণেও ঘটে ব্যত্যয়। বোধের অভাবে ব্যক্তি উপযুক্ত internalization[৬১] ও institutionalization[৬২] থেকে বিচ্যুত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণিত 'ঈশ্বর' বা 'কালী' কার্যত চেতনাকে চৈতন্যমুখী করার ধর্মীয় পারিভাষিক প্রকাশ।[৬৩] বস্তুত তিনি 'সত্য' বা 'কালী'র মাধ্যমে সত্যের প্রতি মানুষকে অনুমুখী করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর বক্তব্য: 'সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান'[৬৪] 'যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়'[৬৫] —'আর এই জ্ঞান আহৃত হয়, শুদ্ধাভক্তির চর্চায়।'[৬৬] বিবেকানন্দের ভাষায় এই প্রকৃতি হল 'ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা' (attempt to transcend the limitation of senses)। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই চেয়েছেন প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার স্বকীয় সত্তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান ও সচেতন (conscious) হয়। একই উদ্যোগে কল্পতরু হওয়াকালে সমবেত ভক্তবৃন্দকে তিনি কেবল এই আশীর্বাদ জানিয়েছেন—'তোমাদের চৈতন্য হোক।' এই প্রত্যয়ের সূত্র ধরে এগিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আমরা ধর্মের সব মূল্যায়ন পাই। তাঁর কাছে 'ধর্মের তাৎপর্য ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ এবং দৈনন্দিন জীবনে ঐ দেবত্বের প্রয়োগ।'[৬৭] স্বামীজীর কণ্ঠে এই বক্তব্যের বাণীরূপ হল—'Civilization is the manifestation of divinity in man' (মানুষের দেবত্বে-উদ্ঘাটনই হল সভ্যতা)[৬৮]। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্ জ্যাকব নিড্লম্যান (Jacob Needleman, ও শামুকের (Schumacher, 1981)[৬৯] নবচেতনার যোগ ও আত্মজ্ঞান লাভ প্রচেষ্টার মধ্যে এই হতাশা জর্জর সমাজের যে মুক্তির চিত্র এঁকেছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যয়েরই অনুরণন।

পরবর্তী (নবম) শর্ত হল **অহিংসা ও সত্যাগ্রহী আন্দোলনে অভ্যস্ত হওয়া।** জিঘাংসার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সমর্থন না থাকলেও 'অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ফোঁস করতে'[৭০] তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর আন্দোলন প্রকৃতি নতুনতর। তেজস্বী বিপ্লবীর মত অতিবড় ব্যক্তিত্বের কাছে পরাভব স্বীকার না করে তা সমালোচনা করতে (রাণী রাসমণিকে প্রকাশ্যে চড় মারা, জমিদার মথুরবাবুকে একাধিকবার মারতে ছুটে যাওয়া)[৭১] রাজা সৌরিন্দ্র ঠাকুরকে রাজা বলতে না পারার ঘোষণা' এতটুকু পিছু পা হননি।'[৭২] আবার প্রতিপক্ষের কাছে সম্ভ্রান্ত বিনয়ও তাঁর মত কেউ দেখাতে পারেনি। সেদিন কলকাতায় সমবেত জ্ঞানী-গুণী জনের সামনে নিঃসঙ্কোচে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন 'ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানিং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।'[৭৩] অত্যন্ত মানসিক দৃঢ়তায় তিনি এজাতীয় অহিংসা আন্দোলনের সামিল হতেন। প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা জানাবার দুর্বার সাহস প্রচণ্ড পুরুষকার ব্যতীত সম্ভব নয়। পুরুষকার পূর্ণ হয় সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিধর্মীয়তার সাহায্যে। অধ্যাপক অম্লান দত্তকে অনুসরণ করলে আমরা অহিংসার দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা পাব—"দ্বন্দ্ব স্বার্থের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। এর প্রথম স্তরে আধিপত্য বিদ্বেষের। দ্বিতীয় স্তরে, যুক্তি ও স্বার্থের। তৃতীয় স্তরে যুক্তির সঙ্গে মঙ্গলবোধ যুক্ত হলেই তবে সমাজ রক্ষা পেতে পারে সংঘাত ও সংঘর্ষ থেকে। এই শেষ স্তরের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন গান্ধী, অহিংসার ভাষায়। যুক্তিকে বিদ্বেষের কবল থেকে রক্ষা করবার সংগ্রামে তিনি পথিকৃৎ।"[৭৪] এ হেন গান্ধী জানান, 'শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন 'অহিংসার এক মূর্ত দৃষ্টান্ত।'[৭৫] অহিংস আন্দোলনের আর এক বহিঃপ্রকাশ সত্যাগ্রহ। সত্য ব্যতীত অহিংসা আন্দোলন চলে না। বলেছেন মহাত্মা গান্ধী। সত্যাগ্রহের প্রায়োগিক নৈপুণ্য গান্ধীজী জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন। সদ্যমুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলার বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের অক্ষরেখায় ছিল সত্যাগ্রহ ও অহিংসা। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কেবল সামাজিক শৃংখলার সাম্যই রক্ষা করে না, 'এর মাধ্যমে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রতিপক্ষকে পুংখানুপুংখ অবহিত করার সুযোগ থাকে এবং পারস্পরিক সৌহার্দের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসার অবকাশ পাওয়া যায়।'[৭৬] শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন 'দেওঘর (১৮৬৮) ও রাণাঘাটের (১৮৭০) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাহায্যে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নিরন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষীদের জমিদারতন্ত্রের বাধ্যতামূলক খাজনা ভার লাঘব করেছিলেন।'[৭৭] সর্বোপরি সম্প্রীতি ও মমত্ববোধকেই তিনি সামাজিক সংহতির বিশেষ শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাই তাঁর কণ্ঠের সেই ঘোষণা আজও সমান প্রাসঙ্গিক—'তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাকবে—তবেই মঙ্গল হবে। আর আনন্দে থাকবে।'[৭৮]

পরিশেষ শর্ত (দশম) **নেতৃত্বের বিশ্লেষণ।** তিনি প্রায়শই বলতেন, 'সংসারে থেকো যেন বড় মানুষের ঝি'[৭৯] বা 'ঝড়ের এঁটো পাত হয়ে।'[৮০] এ জাতীয় বক্তব্যের তাৎপর্য একটাই যে, পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হলে ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বজনপোষণ

প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যয়ের শিক্ষা বড়ই কার্যকরী ও বর্তমান সমস্যা সমাধানের পথ-প্রদর্শনও বটে। জাতীয় জীবনে অধুনা বিস্তৃত যে গণহিংসা—তার উৎস হিসাবে জাতিগত বিদ্বেষ, বঞ্চনা ও হতাশার কারণ উপেক্ষা করার নয়; কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কেবল যে সংহতিই বিঘ্নিত হয় তা নয়, উদ্দেশ্য থেকে আন্দোলনকেও বিচ্যুত হতে হয়। কারণ মনস্তত্ত্বমতে গণহিংসা গণহত্যা অসুস্থ মানসিকতার প্রকাশ। এবং যেহেতু যুক্তিবোধ সেখানে গৌণ, উপলক্ষ্যগত ভ্রান্তি উদ্দেশ্যকে সাফল্যের পথে উজান হাঁটাতে ব্যর্থ হয় অধিকাংশক্ষেত্রেই। এ মন্তব্যও মনোবিজ্ঞানের। আন্দোলনের পূর্বশর্ত হল বিক্ষোভের কারণসমূহ আন্দোলনকারীদের চোখের সামনে ধরে রাখা এবং এ দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে সংগঠকদেরই। মনোবিজ্ঞানী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গণহিংসা সম্পর্কে বলেছেন, 'গণহিংসায় জড়িত বেশির ভাগ মানুষই ব্যক্তিগতভাবে সৎ কিন্তু ভ্রান্ত পথে চালিত।'[৮১] কাজেই নেতৃত্বের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য অনেক সময় দেশীয় নেতারা যুবসমাজের কাছে ভুরি ভুরি সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি রেখে যান। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর জাতীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই বিস্মৃত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই নেতৃত্ব প্রসঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছেন—'(কেবল) লেকচার দিলে কিছুই হয় না। চাপরাশ থাকলে ঈশ্বরের আদেশ (সত্য প্রত্যয়) থাকলে তবেই লোকশিক্ষা (দেশসেবা) হয়।'[৮২] এই প্রত্যয়ে অধিকারী হওয়ার জন্যই তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছেন, 'তমোগুণের (ব্যক্তিস্বার্থের) মোড় ফিরিয়ে দাও—অহংবুদ্ধি (স্বার্থবুদ্ধি) যাতে যায় সে বিষয়ে যত্নবান হও।'[৮৩]

বিচ্ছিন্নতা নিরসনে শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত মডেল :

আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি আজকের বিচ্ছিন্নতা কিভাবে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিচিত্র বিচ্ছিন্নতার উৎস অন্বেষণ করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিচ্ছিন্নতা নিরসনে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবিদগণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা দেখানো হয়েছে। কার্যত শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা নির্দেশসমূহের নিয়মানুগ রৈখিক বিন্যাসের এক যৌথ মডেল রচনা করা যায়, যার অক্ষ ব্যক্তি চরিত্র গঠনের পরিচায়ক এবং পার্শ্ববিন্যাস পারিবারিক ও সামাজিক সংহতির সম্ভাব্য রূপরেখা। পরিশেষে এই বিচ্ছিন্নতার অনিবার্য ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবীর কথাই পুনরায় স্মরণ করতে হচ্ছে :

'এই গভীর সঙ্কটের মুহূর্তে মানবজাতির পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভারতীয় পথ—(যেখানে) শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে সমগ্র মানবজাতি মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে একযোগে অগ্রসর হতে পারে।'[৮৪]

তথ্যসূত্র :

১. চতুরঙ্গ, ৪৯ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮, পৃ: ৩৯২
(কবিতা : আত্মহননেব কাবাগারে—খসরু পাবভেজ)

২. আমিই কচ আমিই দেবযানী—পূর্ণেন্দু পত্রী, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃঃ ৬১-৬২

৩. বর্তমান (পত্রিকা), ১৩ মে, ১৯৮৭ ; পৃ: ৩

৪. সানডে, জুলাই ১৮, ১৯৭৬ ; পৃ: ২৩-২৪

৫. বর্তমান, মে ১৩, ১৯৮৭ ; পৃ: ৩

৬. After Divorce: Goode W. J. (1956); Free Press: p. 307

৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, মে ২২, ১৯৮৮ (ববিবাসবীয়) নতুন মূলবোধের সন্ধানে—সমীক্ষক : পার্থ চট্টোপাধ্যায সাক্ষাৎকাব নিযেছিলেন নিম্নলিখিত চিন্তাবিদ্‌দেব কাছ থেকে—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ভগবতীপ্রসসাদ ব্যানার্জী, মহাশ্বেতা দেবী, অম্লান দত্ত, বিমল কব, ভাবতী বায, সন্তোষ ভট্টাচার্য ও মৃণাল সেন।

৮. ম্যাক্স হেভার, ট্যালকট পাবসন, ডেভিস প্রমুখ সমাজবিদগণ কেবল অর্থনৈতিক শর্তকে বিচ্ছিন্নতার কাবণ হিসাবে চিহ্নিত কবতে নারাজ। তাঁরা এই বিচ্ছিন্নতাব পূর্বশর্ত হিসাবে বিবিধ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যকে নির্দেশ করেছেন। ম্যাক্স হেভাব মনে কবেন, 'There is a direct relation between the practical ethics of a community and the charater of its economic system'—(i) Mac Iver and Page (1959) Society', Mac Millan & Co. London. p. 582. (ii) Person. T (1964)- 'Essays in Sociological Theory', The Free Press of Glencoe. London, p. 53, (iii) Davis. K (1966)—'Human Society' Surjeet Publications, Delhi. 1981. p.20

Emotion Shibbus, W, The Language Press. Wisconsin, 1971 p. 49-58
Social Psychology -- La Piere, R.T. and P.R. Farnsworth, 1949 p. 184
Adolescent Aggression--Bandura, A and R. Walters, Ronold Press. New York. 1959, p. 371
বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ (২য়)—ধীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৮ পৃ: ১৩৫
Hand Book of Social Psychology—Young, K. Kegan Panl, London, 1948,

একটি মূল্যায়ন : উনিশ শতকের জাগরণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

উনিশ শতকের জাগরণ এক ঐতিহাসিক সত্য। এই আন্দোলনকে ঐতিহাসিকগণ নানা চোখে দেখেছেন। অনেকে এরমধ্যে বিশেষ ইতিবাচক দিক দেখেন[১]; অনেকে দেখেন কেবল নেতিবাচক দিক।[২] অনেকেই বলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ এদেশে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার সৃষ্টি করেছে।[৩] আবার অনেক ঐতিহাসিক কোন একপেশে যুক্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন।[৪] যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকগণ কেবল দু একটা নমুনা সম্বলে কোন ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে অনাগ্রহী। তাঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়নের পক্ষপাতী। প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজ উল্লেখ করেন, জাগরণীয় চেতনা মূল্যায়ন করতে হলে লক্ষ্য করতে হবে ঐ জাগরণীয় চেতনার অনুকূল শর্তগুলির (ধর্মনিরপেক্ষতা, নারীজাগরণ, বিজ্ঞান অনুশীলন, কৃষক সমস্যার সচেতনতা, মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক আদর্শের বিশ্বাস, যুগ-চেতনায়, জাতীয় ঐতিহ্যে আস্থা, সমাজতান্ত্রিক চেতনা, জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিক চেতনার পরিস্ফূরণ) যথার্থ বিন্যাস ও বিকাশের মাত্রা।[৫] একাধিক উপশর্তের প্রতিপালন ও পরিপোষণ সাপেক্ষে উল্লিখিত উনিশ শতকের নবচেতনার-মূল্যায়ন সম্ভব (প্রতিটি চেতনার স্বপক্ষে দশটি করে উপশর্ত নির্বাচন করা হয়েছে)। উনিশ শতকের জাগরণ একাধিক গোষ্ঠীর (আন্দোলন) ঘাত-প্রতিঘাত ও সমন্বয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে এবং পরিণতি পেয়েছে। ইতিহাস সমৃদ্ধ ঐ সংগঠনগুলি হল: (ক) রক্ষণশীল গোষ্ঠী (খ) ব্রাহ্মসমাজ (গ) ইয়ংবেঙ্গল (ঘ) সংস্কারক গোষ্ঠী (ঙ) প্রার্থনা সমাজ (চ) আর্যসমাজ (ছ) থিওজফি (জ) খ্রিস্টান মিশনারি গোষ্ঠী (ঝ) মুসলমান সমাজ ও (ঞ) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলন)। জাগরণীর চেতনার প্রতিশর্তের জন্য আমরা যে সমস্ত উপশর্ত নির্বাচন করেছি তাদের তালিকা দেওয়া হল :

(অ) **ধর্মনিরপেক্ষতা :** পরধর্মে নিস্পৃহতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, পরধর্মে সম্প্রীতি, মতান্ধতার বিরোধিতা, ধর্মীয় উন্মত্ততার বিরোধিতা, পুরোহিততন্ত্রের বিরোধিতা, আচারতন্ত্রের বিরোধিতা, ধর্মীয় সামাজিকীকরণের অনুসরণ, ধর্মীয় রাজনীতিকরণের বিরোধিতা ও ধর্মীয় বিশেষাধিকারের বিরোধিতা।

(আ) **নারীজাগরণ :** পর্দা প্রথার বিরোধিতা, নারী শিক্ষার প্রসার, নারী স্বাধীনতা, নারীর রাজনৈতিক চেতনার প্রসার, নারীকর্তৃক সংগঠনের নেতৃত্বদান, সতীপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ, বাল্যবিবাহরোধ, বহুবিবাহ বা কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিধবা

বিবাহ প্রবর্তন ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(ই) **বিজ্ঞান অনুশীলন :** বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রযুক্তিবিদ্যার সমর্থন, যুক্তিবাদে বিশ্বাসী, অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা, কুসংস্কারের বিরোধিতা, শাস্ত্রীয় অনিবার্যতার বিরোধিতা, পাশ্চাত্যে শিক্ষার সমর্থন, জাতিভেদের বিরোধিতা, বস্তুবাদের সমর্থন ও কর্মফল বা পরকালে অবিশ্বাস।

(ঈ) **কৃষকসমস্যার সচেতনতা :** জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ, মহাজনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ, নীলকরদের বিরুদ্ধাচরণ, রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কৃষক সমস্যার সপক্ষে জনমত গঠন, সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠন, অহিংস সংগ্রাম সংগঠন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধাচরণ, মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধাচরণ ও কৃষকসমস্যার অনুকূলে পরামর্শদান।

(উ) **মানবিক মূল্যবোধের সৃজন :** মনন, মমত্ববোধ, ন্যায়বোধ, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, সহিষ্ণুতা, দায়িত্ববোধ, অন্যায় প্রতিরোধ, আত্মসমালোচনা ও সমাজবোধ।

(ঊ) **গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস :** রাজতন্ত্রের বিরোধিতা, স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জনমত গঠন, দাবীর অনুকূলে গণবিক্ষোভ, প্রতিনিধিত্বের দাবি, সামাজিক ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার বিরোধিতা, যৌথ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস, রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবি।

(ঋ) **যুগচেতনায় ভারতীয় আদর্শ :** বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রত্যয়, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, অনাক্রম্যতা, অতীত ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাবোধ, সত্যনিষ্ঠা, ধর্মচেতনা, পরসভ্যতা আত্তীকরণ, মনুষ্যত্বের চর্চা ও ত্যাগাদর্শে শ্রদ্ধা।

(৯) **সমাজতন্ত্রের প্রত্যয় :** মানুষের অধিকার, শ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক-জ্ঞান, শ্রমিক সমস্যার ভাবনা, প্রলেটোকার্ন্টের ধারণা, বিশেষাধিকার বিলোপ, সামাজিক বৈষম্যে অনীহা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিবাদ, ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্জন, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিবাদ।

(এ) **জাতীয়তাবোধ :** ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য, ব্রিটিশ বিরোধী প্রকাশনা, সংশ্লিষ্ট আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন তৈরী, জনসংযোগ, স্বদেশপ্রীতি, আধুনিক শিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও অসাম্প্রদায়িকতা।

(ঐ) **আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণা :** বৈদেশিক সংস্কৃতির সমর্থন, সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নিন্দা, উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থন, সার্বভৌমিকতার সমর্থন, অর্থনৈতিক শোষণের নিন্দা, যুদ্ধবিরোধীনীতির সমর্থন, আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার পরিপোষণ।

খুব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতাগণ উনিশ শতকের জাগরণীয় চেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল ভূমিকা দেখতে পান না এবং দেখলেও তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমিত গণ্ডীতে।[৬] সত্যের এ অপলাপ যেমন নিন্দনীয় তেমনই বিভ্রান্তিকর। 'উনিশ শতকের জাগরণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ক লেখনী নেহাৎ

নগণ্য নয়[৭], তবু ইতিহাস চৌহদ্দিতে তার অনুপ্রবেশের দ্বিধার সঠিক কারণ অজানা। শ্রীরামকৃষ্ণ উনিশ শতকের ইতিহাসে চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। উনিশ শতকের জাগরণীয় চেতনায় তাঁর ভূমিকা যেকোন প্রথানুগ সংস্কার-গোষ্ঠীর চেয়েও ছিল ব্যাপকতর ও গভীরতর। সেই সত্যমূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই এই বিশ্লেষণমুখী বিবরণের অবতারণা।

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের শরিক গোষ্ঠী :

এই অধ্যায়ে উনিশ শতকের রেনেসাঁস তথা নবজাগরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা আলোচনা করা হবে।

(ক) **ব্রাহ্মসমাজ :** উনিশ শতকের সামাজিক পটভূমিতে রাজারামমোহন রায় ও তাঁর চিন্তাধারা পুষ্ট ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অপরিসীম ছিল। এই আন্দোলনের সূত্রপাত রামমোহনের হাতে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫ সাল) স্থাপনের মাধ্যমে। পরে তা 'ব্রাহ্ম সভায়' রূপ নেয়। পরবর্তীকালে সেই প্রতিষ্ঠানই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে নতুন প্রাণপ্রাচুর্য পায় এবং নতুনভাবে নাম নেয় 'ব্রাহ্মসমাজ'। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন ১৮৫৮ সালে ; এরপর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিরা। উনিশ শতকের নবজাগরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুবিধ প্রগতিবাদী ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান নিবিষ্ট ছিল। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম সর্বজনবিদিত। নারীশিক্ষার প্রসার, নারী স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহরোধ, বহুবিবাহরোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনেও এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়তা স্মরণীয়।[৮] বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' সর্বাংশে সোচ্চার ছিল। সেখানে প্রযুক্তিবিদ্যার সমর্থন জানানো হয়েছে, কুসংস্কারের বিরোধিতা করা হয়েছে, জাতিভেদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষায় পুরোহিততন্ত্রের বিরোধিতা, আচারতন্ত্রের বিরোধিতা ও ধর্মীয় সামাজিকীকরণ প্রমুখ প্রগতিবাদী ক্রিয়ার ধারা সেখানে লক্ষিত। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে কৃষক সমস্যার প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্যণীয়। তারা কৃষক সমস্যার প্রতি সোচ্চার হয়েছে।[৯] ভূস্বামী, রাজ-কর্মচারী রাজার অপশাসন ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, প্রজাদের দুরবস্থা দূরীকরণে এবং কৃষকদের উন্নতির দাবি তারা সরকারের কাছে জানিয়েছে।[১০] এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলিও স্মরণ প্রয়োজন। রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য নেতৃবর্গ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলি জানালেও এবং চাষীদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও ঐ প্রথা বিলোপের দাবি করেননি। এমনকি তাঁরা জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধনেও যত্নবান হননি।[১১] 'মানবিক মূল্যবোধের পালন তাঁদের কর্মসূচীর তালিকায় থাকলেও সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, দায়িত্ববোধ ও আত্মসমালোচনার ঘাটতি ব্রাহ্মসমাজে ছিল। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীরা। স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা,[১২] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা[১৩] অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া,[১৪] ইংরাজ শাসকের কাছে প্রতিনিধিত্বের দাবি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভীপ্সা,[১৫] সামাজিক ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আদর্শ[১৬] তাঁদের প্রকৃতিতে বর্তমান ছিল। ভারতীয় আদর্শের তাঁরা

পৃঠেপোষক ছিলেন। জাতীয়তাবোধজ্ঞাপক হিন্দুমেলা ও স্বদেশী সঙ্গীত প্রভৃতিতে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।[১৭] রামমোহনের আন্তর্জাতিক প্রত্যয় বিতর্কের ঊর্ধ্বে তথাপি উল্লেখ করতেই হবে যে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহ' বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[১৮] নীলচাষের প্রতি তাঁর অনুকূল মনোভাব প্রগতিবাদের পরিপন্থী। সর্বোপরি স্মরণীয়, ব্রাহ্মসমাজীদের স্ববিরোধিতা এবং উনিশ শতকেই তার ক্রমখণ্ডন ও বিলোপ।

(খ) **ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী:** ডিরোজিও (১৮২৬) ও হিন্দুকলেজের ছাত্র গোষ্ঠীর (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ) সম্মিলিত প্রভাব ভারত ইতিহাসে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী নামে পরিচিত। বহুক্ষেত্রে তাঁরা যেমন নিন্দিত, তেমনি বহু ঐতিহাসিকের কাছে তাঁদের প্রগতিবাদী চিন্তা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১৯] আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রসঙ্গে তাঁদের ভূমিকা নগণ্য নয়। তাঁদের উদ্যোগে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার, কুসংস্কারের বিরোধিতা, ধর্মীয় জাতিভেদের বিরোধিতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। নারী প্রগতির প্রতি তাঁদের সমর্থন স্মরণীয়। ডঃ পুরকায়েত উল্লেখ করেছেন, "The Derozians were straunch supporters of individual liberty, widow-marriage prohibition of Sati, child marriage and free labour." ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শও ইয়ং বেঙ্গলের বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ এই চেতনার সীমাবদ্ধতা তাঁদের আন্দোলনকে বহুলাংশে খর্ব করেছে। ডঃ স্বপন বসু উল্লেখ করেছেন, "তাঁরা সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের পরিবর্তে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই ক্রুসেড রচনা করেছিলেন।"[২০] তাঁদের সঙ্গে 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'রক্ষণশীল গোষ্ঠীর' দ্বন্দ্ব ধর্মীয় উন্মত্ততাকে ব্যক্ত করে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকেই পরবর্তীকালে অতি আধুনিকতা বিসর্জন দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। কৃষকসচেতনতায় তাঁদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্যণীয়; ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিন্দা করেছে; জমিদারদের শোষণ প্রবৃত্তির কথা ব্যক্ত করেছে; সেইসঙ্গে জানিয়েছে কোম্পানীর পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থা।[২১] জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা তাঁদের মধ্যে বহমান ছিল। তাঁদের হাতেই দেশাত্মবোধক সংগঠন 'দেশহিতৈষী সভা' গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক চেতনার স্বপক্ষে তাঁদের পদক্ষেপ বিশেষ স্মরণীয়। কিন্তু যুগচেতনায় ভারতীয় আদর্শের সাঙ্গীকরণ তাঁদের মধ্যে ঘটেনি। 'তাঁদের আচার-আচরণের স্ববিরোধিতা ছিল যথেষ্ট। গ্রামবাংলার বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবীর জনগণের দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁরা তেমন অবহিত ছিলেন না'।[২২] মুসলিম সমাজ সম্পর্কে রচনাতেও অবজ্ঞার মনোভাব দেখা যায়। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার বলেছেন, "উনিশ শতাব্দীর প্রগতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে পারেনি যে, ভারতে ইংরাজ শাসনে মূল উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশকে নির্মমভাবে শোষণ করা। ইয়ংবেঙ্গল কোন ক্রমবর্ধমান আন্দোলন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদ গড়ে তুলতে পারেনি।"

(গ) **সংস্কারপন্থী:** সংস্কারপন্থী তথা 'Moderates' গোষ্ঠী উনিশ শতকের

নবজাগরণের অন্যতম প্রতিনিধি। এই গোষ্ঠীর বিশেষ প্রতিনিধি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও হরিশচন্দ্র মুখার্জী। তাঁদের মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রমুখ বিশেষ প্রগতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে ঐ শতকে। আধুনিকতার প্রশ্নে বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ,[২৩] দেশের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কুসংস্কারের বিরোধিতা, যুক্তিবাদে বিশ্বাস, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন ঐ গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা।[২৪] নারীপ্রগতি বিষয়ে বিধবা বিবাহের প্রত্যাবর্তন তাঁদের বিশেষ কীর্তি। সেই সঙ্গে বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের নিন্দায় তাঁরা মুখর ছিলেন; তাঁদের উদ্যোগে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগণা জেলায় বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয স্থাপিত হয়েছিল। পরধর্মে নিস্পৃহতা, পরমতসহিষ্ণুতা, পুরোহিততন্ত্র ও আচারতন্ত্রের বিরোধিতা, ধর্মীয় বিশেষাধিকারের নিন্দা প্রমুখ ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল নমুনা তাঁদের কর্মধ্যাসে বহমান ছিল। ইয়ংবেঙ্গলদের মতো কখনো তাঁরা হিন্দুধর্ম ও আচরণবিধির বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেননি অথবা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মতো স্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কৃতিকে বর্জন করার কথা বলেননি।[২৫] সেই কারণে সমাজ সংস্কারের উদ্যোগে শাস্ত্রীয় আলোচনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। হিন্দুর বর্ণচিহ্ন উপবীত আমৃত্যু ঈশ্বরচন্দ্র ধারণ করেছিলেন।[২৬] ঈশ্বরচন্দ্রের লেখনীতে নীলকরদের সমালোচনা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিবাদ, জমিদারতন্ত্রের বিরোধিতা না থাকলেও তাঁর সমর্থনপুষ্ট পত্রিকা (হিন্দু পেট্রিয়ট) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। যুগচেতনায় ভারতীয় আদর্শের প্রতি সমর্থন সংস্কারপন্থীদের কর্মধারায় লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাসাগর আচার-আচরণে আজীবন ভারতীয় ও বাঙালী ছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি সমর্থন, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগাদর্শ ও মনুষ্যত্বের চর্চা তাঁর জীবনীতে বাঙ্ময়। শিক্ষা সংস্কারেও জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিস্ফূরণে অগ্রণী ছিলেন বিদ্যাসাগর। ডঃ পুরকায়েত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, 'Promoter of national education and three language formula'-র প্রবক্তা বলে চিহ্নিত করেছেন।[২৭] তিনি তাঁর বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে ইম্পি ও হেস্টিংসকে অধিক দুরাচার বলে চিহ্নিত করেছিলেন; এদেশীয়দের অপমানে তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটির' প্রবেশ থেকে নিরত ছিলেন। এ সমস্ত উদ্যোগ তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার আনুকূল্য দেয়। সাঁওতাল পল্লীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্যোতক। বিদ্যাসাগরের প্রগতিবাদী চেতনার নমুনা যথেষ্ট থাকলেও জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, নীলকর অত্যাচার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মহাবিদ্রোহের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে তাঁর নীরবতা বড় ভাবায়।[২৮] সংস্কারপন্থী গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রপত্রিকায় আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, জার বিরোধী নিহিলিস্ট আন্দোলন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রকাশ তাঁদের আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতি সহমর্মিতা দর্শায়।[২৯] অন্যতম প্রখ্যাত সংস্কারপন্থী নেতা অক্ষয় কুমার দত্ত সেকালের বিজ্ঞান সচেতন যুক্তিবাদী বলেই কথিত, তাঁর সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে ত্রিপুরার শঙ্কর সেন মন্তব্য করেছেন: "অক্ষয় কুমার দত্ত জ্ঞানতাপস হলেও

পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ হতে মুক্তি লাভ করতে পারেননি; তিনি ভারতীয় সাধনার মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারেন নি; এক্ষেত্রে তাঁর সমন্বয়ী দৃষ্টির বড় অভাব বোধ হয়।”

(খ) **আর্যসমাজী :** দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাই-এ আর্যসমাজ গঠন করেন ১৮৭৫ সালে। নবজাগরণে তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে আলোচিত। আধুনিকতার সপক্ষে শিক্ষাবিস্তার, (ইঙ্গ-বৈদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা, গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রমুখ)[৩০], যুক্তিবাদের সমর্থন, জাতিভেদের বিরোধিতা, অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা[৩১] প্রমুখের সমর্থক। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। নারীপ্রগতি বিষয়েও তাঁর চিন্তাভাবনা উল্লেখের দাবি রাখে; ‘দয়ানন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বেদ মূর্তি পূজা অনুমোদন করে না, অনুমোদন করে না অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ ও নারীদের ওপর পুরুষের আধিপত্য।’ শিক্ষার ব্যাপারে নারীপুরুষের সমান অধিকার ব্যক্ত করলেও, বৈদিক যুগে সহশিক্ষা না থাকায় দয়ানন্দ ‘সহশিক্ষা’র বিরোধিতা করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তিনি একপক্ষীয়। পরমতসহিষ্ণু হতে পারেননি। ভারতীয় ধর্মাদর্শে শ্রদ্ধাশীল হয়েও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পরধর্ম সম্প্রীতির ভাব দেখাননি। তিনি মূর্তিপূজা, আচারতন্ত্র, লোকাচারের বিরোধিতা করেছেন এবং ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন;[৩২] সেইসঙ্গে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়ে (বেদ শ্রেষ্ঠ চিন্তার ধারক হয়ে) “মুসলমান মোল্লা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুকোমল সেন মন্তব্য করেছেন, “দয়ানন্দের ভূমিকা ছিল ধর্মান্ধতার পক্ষে”।[৩৩]

কৃষক সমস্যার প্রসঙ্গে সামগ্রিক প্রবণতা ব্যক্ত না হলেও ঐ প্রকৃতির শোষক ব্রিটিশ শাসকের প্রতি বিরোধিতা দেখাতে পিছপা হন নি। ভারতীয় আদর্শের সহমর্মিতায় তাঁর ‘আর্যসমাজ’ চেতনা বড় আঙ্গিক।

দয়ানন্দ ‘আর্যসমাজ’ (বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তন) আওয়াজ তুলে বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যে সংহতি, গৌরববোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডঃ পুরকায়েত জানান, “হিন্দিকে জাতীয় ভাষা করার যে আন্দোলন, তার প্রবক্তা দয়ানন্দ এবং তা আজ জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।”[৩৪] গণতান্ত্রিক চেতনাধারা আর্যসমাজদের মধ্যে বহমান ছিল। সমকালীন সমাজে সংগঠন ও প্রকাশনার (সত্যার্থ প্রকাশ—আর্যসমাজের মুখপত্র) মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যকে জনমানসে প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও তাঁর কার্যকলাপ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছিল, তবু স্মরণীয় যে, এই সমাজ থেকেই ভাই পরমানন্দ, লালা হরদয়ালের মত বিশিষ্ট বিপ্লবী জন্মলাভ করেছিল এবং ভারতে চরমপন্থা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অধুনা বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের চোখে আর্যসমাজের আন্দোলন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিরোধী, বিজ্ঞান বিরোধী ও ধর্মান্ধতার রক্ষকরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা আদৌ প্রগতির পক্ষে নয়।[৩৫]

(ঙ) **খ্রিস্টান মিশনরি গোষ্ঠী :** খ্রিস্টান মিশনারিদের মুখ্য উদ্দেশ্য খ্রিস্টধর্ম প্রচার

হলেও ভারতীয় নবজাগরণে তাদের পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারীজাগরণ তথা সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাদের পরোক্ষ মদত স্মরণীয়। ডাঃ টমাস, উইলিয়াম কেরী, এডওয়ার্ড এ ব্যাপারে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব।[৩৬] কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল খ্রিস্টান পত্রিকা 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চান অবজারভার'। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে তাঁরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগেই স্থাপিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি।' কৃষক সমাজের দুরবস্থার কথাও মিশনারিরা ব্যক্ত করেছেন। আলোকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ মিশনারি জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার ব্যক্ত করেছেন।

আধুনিকতা ও বিজ্ঞানচেতনা প্রসারেও তাঁরা উল্লেখের দাবি রাখেন। নিজেদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিহিত থাকলেও মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপন, ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, পাশ্চাত্য জ্ঞান দর্শনের বিস্তার প্রমুখ প্রগতিবাদী কর্মপ্রবাহ তাঁদের হাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উনিশ শতকেই স্থাপিত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স, লা-মার্টিনিয়র ও লরেটো কলেজ।

মিশনারিদের হাত দিয়ে এদেশে ধর্মান্তঃকরণের প্রক্রিয়ায় ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুখোমুখি এসেছিল এদেশের মানুষ। এই মিথোস্ক্রিয়ায় কোন কোন মিশনারি প্রাচ্যপন্থী হয়েছিলেন। এদেশীয়দের পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার গূঢ় উদ্দেশ্য অন্য কিছু থাকলেও—ঐ শিক্ষা এদেশীয়দের লাভবানই করেছে বলে মন্তব্য করেন—এ আর দেশাই। তিনি জানান, "বস্তুতপক্ষে আধুনিক শিক্ষা (মিশনারিদের হাতে পরিবেশিত) প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গণতন্ত্রমুখী করে দিয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হলেও তারা এদেশের ছুঁৎমার্গে বিচ্ছিন্ন অনুন্নত ও দরিদ্র জনগণকে প্রাধান্য দিয়েছে।"[৩৭]

তাঁদের সীমাবদ্ধতাও যথেষ্ট। "এদেশের ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরোধিতা করতেন তাঁরা, আবার নিজেরা বাইবেল শিক্ষার নামে অলৌকিকতা শেখাতেন কোনরকম কুণ্ঠা না নিয়েই। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ তাঁরা কখনোই পালনে সক্ষম হননি। এদেশে খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে কুৎসিত ইঙ্গিতমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ফর সাইফ, ম্যাণ্ডি, রিচার্ড উইলসন প্রমুখ পাদ্রীরা হিন্দুধর্মের নিন্দায় ছিলেন পঞ্চমুখ। পরধর্মসহিষ্ণুতা তাঁদের ছিলই না এবং ধর্মীয় মতান্ধতার ঊর্ধ্বেও উঠতে পারেননি"।[৩৮] মানবিক মূল্যবোধী শর্তের শিক্ষা খ্রিস্টধর্ম প্রচারে থাকলেও জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরিতকরণ তাঁদের অন্যান্য প্রগতিবাদী চেতনাকে কালিমা লিপ্তই করেছে।

(চ) **প্রার্থনা সমাজ :** উনিশ শতকের জাগরণীয় চেতনায় মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রবর্তিত বোম্বাই-এর প্রার্থনা সমাজ (১৮৬৭ সাল) এক স্মরণীয় সংগঠন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আর.জি. ভাণ্ডারকর।

নারীজাগরণ প্রসঙ্গে প্রার্থনা সমাজীদের বহুবিধ কর্মোদ্যোগ ছিল। পর্দা প্রথার বিরোধিতা, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন[৩৯], সতীপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ এবং কৌলীন্য প্রথার

সমালোচনা তাঁদের কর্মসূচীতে ছিল।[৪০] মহারাষ্ট্রে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে ও নারীদের মান উন্নয়নে পণ্ডিত রমাই ও বেহারামজী মালবারির উদ্যোগের নেপথ্যে ছিল প্রার্থনা সমাজীদের প্রেরণা।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠন (ডেকান এডুকেশন সোসাইটি), অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা, জাতিভেদের বিরোধিতা প্রমুখ প্রগতিবাদী চেতনা তাঁদের কর্মসূচীর বিষয় ছিল।[৪১] শাস্ত্রীয় অনিবার্যতার বিরুদ্ধাচরণ করে রানাডে পুনরুত্থানবাদীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "প্রাচীন সমাজে বহু কুপ্রথা ছিল ; দেবতারা নির্বিচারে পশুমাংস ভক্ষণ করতেন, সুরাপান করতেন, অনেক নিষিদ্ধ কর্মে অংশগ্রহণ করতেন, সেই সব প্রথা ফিরিয়ে আনতে হবে নাকি ?"[৪২] প্রার্থনা সমাজ ব্রাহ্মসমাজীদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মধারায় অনুপ্রাণিত।

প্রার্থনা সমাজীদের কাছে আর্যজীবনই ছিল আদর্শ ; ফলে ন্যায়, শ্রদ্ধা, সত্য, মনন প্রমুখ ভারতীয় ঐতিহ্য পালন তাঁদের কর্মসূচীর বিষয়ীভূত ছিল। প্রার্থনা সমাজীদের নিম্নজাতীয় উত্তোরণ ক্রিয়া পর্ব সহযোগিতার প্রত্যয়কে ব্যক্ত করে।

বহু আধুনিক ও প্রগতিবাদী প্রত্যয়ের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর আন্দোলন উনিশ শতকে হাজির হলেও, তাঁরা কৃষক স্বার্থের অনুকূলে কোন চিন্তা-ভাবনা রাখতে পারেননি। যেহেতু তাঁদের কাছে খ্রিস্টান ধর্ম ছিল আদর্শ তুল্য, সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে স্বতন্ত্রভাবে চিনতে তাঁরা ভুল করেছিলেন। সেই কারণেই কৃষকসমস্যা তাঁদের কর্মসূচীতে অবর্তমান। ফলে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ পায়নি। ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রীতি দেখালেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তীব্র আক্রমণে তাঁরা মতান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। রানাডে গভীর ভক্তির সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের বলতেন, "মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং মনুষ্যজীবন পশুজীবন থেকে ভিন্নতর।"[৪৩] তিনি তাঁর আন্দোলনে মানুষের অধিকার, সামাজিক বৈষম্য রোধ প্রভৃতি বিষয় রেখেছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিজে বিশেষ নেতা হিসাবে চিহ্নিতও হয়েছিলেন। তথাপি ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত "প্রার্থনা সমাজীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আক্রমণে এত ব্যস্ত ছিলেন যে সাধারণ মানুষের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।"[৪৪] রানাডে নিজেই অনুশোচনার সুরে পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "The Samaj fails to stir the heart of nation. It pays influences over a few souls."[৪৫]

(ছ) **থিওজফি :** নবচেতনার আন্দোলনে আর এক শরিক থিওজফি। ১৮৭৬ সালে কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কি ভারতে ফিওজফি সোসাইটি প্রবর্তন করেন। এই সংগঠনের সঙ্গে যোগ দেন পাশ্চাত্যের মহিলা অ্যানি বেসান্ত। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় বৈদিক সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রচার করা। ১৯০৫ সালে বেসান্ত লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষে প্রয়োজন হল অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে জাতীয়চেতনার বিকাশ বা ভারতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ।"[৪৬]

এই গোষ্ঠী মুখ্যত ভারতীয় ধর্মাদর্শের অতীন্দ্রিয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় নারী জাগরণের অধিকাংশ শর্তই সেখানে উপেক্ষিত। যদিও নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মে নারীর অংশগ্রহণে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন।[৪৭]

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হলেও বিজ্ঞান অনুশীলন উপেক্ষিত ; জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁরা সকলকে আহ্বান জানালেও তাঁরা কুসংস্কার প্রতিপালনেই যত্নবান ছিলেন। পরলোক প্রেতাত্মা যাদু-জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি চর্চা মধ্যযুগীয় চেতনার দ্যোতক।[৪৮] বেসান্ত-কৃত আচার-অনুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বস্তুতঃ বিজ্ঞানবিরোধী এবং যুক্তি বিরোধী।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তাঁরা সংকীর্ণ, কারণ এই আন্দোলন কেবল হিন্দুপুনরুভ্যুত্থানের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল। শ্রদ্ধা বোধ ও সহযোগিতা থাকলেও মানবিক মূল্যবোধের অন্যান্য শর্ত সেখানে উপেক্ষিত। বেসান্ত গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কদাপি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চেয়ো না।"[৪৯]

যুগচেতনার ভারতাদর্শ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এই গোষ্ঠী অতীত ভারতীয় ধর্মাচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও ত্যাগ-আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা সহযোগিতা প্রমুখ শর্ত সেখানে পালিত হয়নি। থিওজফি সমাজ কৃষকস্বার্থ ও সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ মুহূর্তেও উচ্চারণ করেনি। সর্বোপরি বেসান্তের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিতর্কিত। বেসান্ত নিজেকে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেত্রী হিসাবে চিহ্নিত করলেও, সেই তিনিই ইংলণ্ডে আলিপুর বোমার মামলার আসামী শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করেন। কী সুভাষচন্দ্র, কী সুরেন্দ্রনাথ সকলেই বেসান্তের আন্দোলনে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সমকালীন পত্রিকা (মডার্ন রিভিউ, মাদ্রাজ টাইমস্, বেঙ্গলী) সকলেই বেসান্তের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলরূপে দেখেছে।[৫০] এন সুব্রহ্মনিয়াম উল্লেখ করেছেন, "Theosophy society had little impact on the common people during that time".[৫১]

(জ) **মুসলিম সমাজ:** উনিশ শতকের নবচেতনার প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজের উপস্থিতি ও তার ভূমিকা—প্রাসঙ্গিক বিষয়। গতিমন্থর হলেও ঐ সমাজের সংস্কারপন্থীরা স্থানু আচারতন্ত্রে বিশেষ আঘাত হেনেছিলেন এবং মুসলিম সমাজকে বিশেষ পরিবর্তনের মুখোমুখি করেছিলেন। ঐ সমাজে ঐ শতকে নানা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন (আহম্মদ্ আবদুল), আলিগড় আন্দোলন (সৈয়দ আহম্মদ খান), খিলাফৎ আন্দোলন (মহম্মদ আলি) সাংস্কৃতিক আন্দোলন (মহম্মদ ইকবাল) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য এবং ঐ আন্দোলনসমূহ মুসলিম সমাজে সংস্কার, উন্নয়ন ও জাতীয়তাবোধ জাগরণে বিশেষ ভূমিকাও নিয়েছিল।[৫২]

যেহেতু ব্রিটিশরা এদেশের শাসন ক্ষমতা মুসলিমরাজের পতন ঘটিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেই কারণে মুসলিম সমাজ দীর্ঘদিন তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। ফলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষায় তাঁরা পিছপাই ছিলেন। আলিগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে বিশেষ আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের

ফলে ১৮৭৫ সালে মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ সালে এই কলেজ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছিল।[৫৩] এই আন্দোলনের পথ ধরেই মুসলিম সমাজে নারীদের মুক্তির জন্য এবং পর্দাপ্রথা বিলোপের দাবি ওঠে। তয়াবজী নামে এক শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী মুসলিম এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এই আন্দোলন মুসলিম সমাজে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালায়। ফলে ঐ সময় ঐ সমস্ত প্রাচীন প্রথার কিছুটা হ্রাস ঘটে। সমকালে দেশ জুড়ে অধিক সংখ্যক মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়[৫৪] এবং মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরা জাতীয় আন্দোলনে সামিল হন। ইসলাম যেহেতু বিশ্বমুসলিম আদর্শের নিয়ন্ত্রক, সেই কারণে ঐ আদর্শে আন্তর্জাতিকতার বীজ নিহিত ; 'এই প্রত্যয়ের সৌজন্যেই এদেশের মুসলমান যুবকরা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতা অপেক্ষা সমাজতন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিলেন।' এ মন্তব্য ওম্যালী সাহেবের। সমকালে মুসলিম যুবকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসারে উল্লেখযোগ্য পাঞ্জাব সোস্যালিস্ট পার্টি ও ফ্রন্টিয়ার সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অধিকসংখ্যক মুসলিম প্রতিনিধি।[৫৫]

উনিশ শতকের নবচেতনার অনুকূলে মহম্মদ ইকবাল সংগঠিত আন্দোলন (তাঁর কবিতা) পাঞ্জাবের কৃষকদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছিল, পুঁজি ও শ্রমের ওপর বিশেষ বক্তব্য পরিবেশন করেছিল এবং শোষণের তীব্র নিন্দা করেছিল।

মুসলিম সমাজের আন্দোলনগুলির সীমাবদ্ধতা অপ্রকাশিত থাকেনি ; ধর্মীয় মোড়কে তার প্রকাশ থাকায় তার ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়নি। তিতুমীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছেন ; ওয়াহাবী আন্দোলনও রাজনৈতিক সংগ্রামপর্বে উত্তীর্ণ হয়েছিল ; ফরাজি নেতা শরীয়াতুল্লা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র দুদু মিঞাও কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াতে চেয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও এই আন্দোলনসমূহ স্ববিরোধিতা পরিহার করতে পারে নি। মুসলিম নেতা ইকবাল কৃষক স্বার্থের অনুকূলে বক্তব্য রাখলেও কৃষক শোষণের কেন্দ্রবিন্দু যে জমিদারতন্ত্র, তার উচ্ছেদ চায়নি ; তিনি মুসলিম মহিলাদের পর্দামুক্ত অনুমোদন করেননি।[৫৬] এমনকি তিনি ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র পছন্দ করতেন না। হাণ্টার সাহেব ওয়াহাবী আন্দোলনকে 'সাম্প্রদায়িক আন্দোলন' বলে চিহ্নিত করেছেন। রমেশ মজুমদারের মতে এটি 'জাতীয় আন্দোলন' ছিল না। সর্বোপরি, হতাশাব্যঞ্জকচিত্র লক্ষিত হয় সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁর আলিগড় আন্দোলনের পরিণতিতে। "যে ধর্মীয় সহনশীলতা ও উদার নৈতিক চেতনায় সৈয়দ আহম্মদ ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রসারে প্রগতিশীল ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন মুসলমানদের ব্রিটিশ ভক্ত হিসাবে অনুপ্রাণিত করেন এবং জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করেন তখন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলই ছিলেন।"[৫৮] তিনি শেষ মন্তব্য করেন যে "সৈয়দ আহমদ থেকে ইকবাল পর্যন্ত ভারতে মুসলমান সমাজে

পাশ্চাত্য জ্ঞানার্জন ও ইসলামী বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইসলাম পুনরুজ্জীবনই ঘটেছে। আর ভারতীয় মুসলমান সমাজকে ভারতীয় সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে"।[৫৯]

(ঝ) **হিন্দুপুনরুভ্যুত্থানবাদী:** উনিশ শতকের 'হিন্দুপুনরুভ্যুত্থান আন্দোলনের' অন্যতম গবেষক সুনীতি রঞ্জন রায় চৌধুরীর গবেষণা মতে, এই আন্দোলনের কাল শতকের সাতের ও আটের দশক। এর কারণ হিসাবে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন; একটি মূলগত (basic) এবং অপরটি তাৎক্ষণিক (immediate)।[৬০] মূলগত কারণ হিসাবে দেখা যায়,. উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে দেশের যুবসমাজ দেশীয় প্রথা ও ঐতিহ্যের সংস্কার চেয়েছিল। শতাব্দীর শেষে দেখা যায়, তারা আবার প্রথানুগ ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের জালে জড়িয়ে পড়েছে। এইভাবে সংস্কার ও প্রতি সংস্কার অর্থাৎ Reformation এবং Counter reformation-এ ঘটনার কারণ। দ্বিতীয় অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কারণ হ'ল সমকালীন কিছু ঘটনার (কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টপ্রীতি, ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি, ব্রাহ্ম স্ত্রী স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, ইলবার্ট বিল-১৮৮২ ও সহবাস সম্মতি বিধি-১৮৯১) প্রতিক্রিয়া।

হিন্দু পুনরুভ্যুত্থানবাদীদের দলে বহু নামী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা সমকালীন সামাজিক মর্যাদায় অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯—১৯০২), শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১—১৯২৮), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৮৯১), অক্ষয় কুমার সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) প্রভৃতি। যেহেতু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে হিন্দু রক্ষণশীলতার সুর নিহিত, সেই কারণে এই অধ্যায়ে রাধাকান্ত দেব (১৭৮৮—১৮৬৭), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে আদৌ রক্ষণশীল পর্বে রাখা যায় কিনা সে ব্যাপারে বিতর্ক আছে। ঐতিহাসিকগণও এব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত।[৬১] রাধাকান্ত দেব ঐ আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন, কিন্তু শতকের প্রথমার্ধে রক্ষণশীলতার সপক্ষে তাঁর কণ্ঠ ছিল সরব। সেই কারণে তাঁর সংযুক্তি এই অধ্যায়ে। রক্ষণশীলতার সংগ্রাম ঐ শতকের আগাগোড়াই বহমান ছিল। শতকের প্রথমার্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন রাধাকান্ত দেব এবং দ্বিতীয়ার্ধে ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি।

এই আন্দোলন ধর্মকে রক্ষণশীলতার চর্চা হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল। এতে ধর্মীয় উন্মত্ততা যথেষ্টই ছিল। ভক্তিরসের আতিশয্যে শশধর তর্কচূড়ামণি হাঁচি, টিকটিকির ডাক, মাথার টিকা প্রমুখের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অলৌকিকতাবাদ প্রচারে প্রায় সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। হিন্দু পুনরুভ্যুত্থানবাদের সমর্থক হলেও, আচারতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না বঙ্কিমচন্দ্র।

স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপারে রক্ষণশীলগোষ্ঠী চিরকালই প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখিয়েছে। রাধাকান্ত দেব প্রথম পর্বে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক হয়েও নিজের বাড়ির মেয়েদের শিক্ষায় অংশ নিতে দেননি।[৬২] বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন বিধবা বিবাহ সমর্থন করেননি।

বিজ্ঞান অনুশীলনেই পুনরুভ্যুত্থানবাদীরা ছিলেন পরিপন্থী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বহু লেখনীই বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিষয়ে সম্পৃক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত অপর ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিরোধই লক্ষ্য করা গেছে।

কৃষক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুনরুভ্যুত্থানবাদীদের বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও তাঁরা একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন না। নীল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকান্ত দেব বিশেষ ভূমিকা দর্শান।[৬৩] সরকার নীলবিদ্রোহে নীল কমিশন বসালে, তিনি গভর্নরকে অভিন্দন জানান। রেভারেণ্ড লং সাহেব 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরাজীতে প্রকাশ করায় ব্রিটিশরাজ্যের কাছে বিচারাধীন হলে তার প্রতিবাদে রাধাকান্ত দেব বিচারপতি ওয়ালেসের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ ও গণসাক্ষর অভিযানে উদ্যোগী হন। চাষীদের দুর্ভাগ্যের কারণ যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'—তার ধিক্কার বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে উজ্জ্বল।

মূল্যবোধী চেতনার প্রসঙ্গে রক্ষণশীল পুনরুভ্যুত্থানবাদীরা অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। ন্যায়, নীতি, সততা, শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদির প্রসঙ্গ তাঁদের বক্তব্য ও লেখনীতে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পরিব্যক্ত হত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' 'অনুশীলন' তথা 'চিত্ত শুদ্ধির' কথা পুনঃপুনঃ লিখেছেন।[৬৪]

আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণা অন্যান্যদের লেখনীতে তেমন না থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ছিল সমুজ্জ্বল। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যায় স্বদেশপ্রেমের সহিত বিশ্বমৈত্রী, মানবপ্রেমের সহিত পশুপ্রীতি, নিষ্কাম কর্মের সহিত বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের লৌকিক কাম ও ভক্তি ধর্ম একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।"[৬৫]

গৌতম চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশক থেকেই ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা অস্পষ্টভাবে দেখা দিতে থাকে।'[৬৬] জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীগুলি সম্পৃক্ত, ফলে তা সমকালে জাতীয়তাবোদী চেতনা জাগরণের অনুকূল শর্ত হিসাবেই দেখা দিয়েছিল।

এই সমস্ত ধনাত্মক শর্ত সহ-ই ঐতিহাসিকগণ পুনরুভ্যুত্থানবাদীদের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরাজ রাজন্যবর্গের প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। তিনি কৃষক সমস্যার চিত্র তুলে ধরতে গিয়েও দ্বিধাগ্রস্ত। বলেছেন, 'কৃষকদের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে ; অনেকস্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল।'[৬৭] বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ হিন্দুধর্মীয় আবেদনের সংযোজন ঘটায়...যা পরবর্তীকালে রক্ষণশীলতা পরিপোষণ করে হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।[৬৮]

নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কিছু লিখে রেখে যাননি। তাঁর বক্তব্যের ভগ্নাংশ মাত্র সংগৃহীত। তাঁর আদর্শ ও শিক্ষায় পরিপুষ্ট দুই ব্যক্তিত্ব মা-সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের অভিব্যক্তি বলেই ধরতে হবে। এই আলোচনায় তাঁদের উপস্থিতি

খুবই স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক। তবে আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে মুখ্যত শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যই উপস্থিত করতে চেষ্টা করব।

নারীমুক্তি আন্দোলন: উনিশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনে সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহই প্রধান কার্যকরী উদ্যোগ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষার ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজী ও অন্যান্য সংস্কারক গোষ্ঠীর উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু জাগরণীয় চেতনার সমর্থক নারী জাগরণের অন্যান্য উপশর্ত যেমন, পর্দা প্রথার বিলোপ, নারীর স্বাবলম্বন, নেতৃত্বে নারীর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোন সংস্কার সংগঠনের ইস্তাহারেই লক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন সংস্কারকগণ সমকালীন নারী দুর্গতি বলতে কেবল 'সতী' সমস্যা এবং তার প্রতিবিধানে 'বিধবা বিবাহেই' শেষ ভেবেছিলেন। এমনকি এটাই নারী জাগরণের সার্থক পদক্ষেপ বলে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে নারী জাগরণের বহুশর্ত সেখানে উপেক্ষিত। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মহীয়সী নারীদের আবির্ভাব ঘটিয়েও সমাজ নির্দেশের বলয় পরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের পায়ে; রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অসংখ্য রচনা লিখেও ব্যক্তিগত জীবনে কন্যাদের বিবাহ দেন বাল্যকালেই। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ এতকাল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে গদ্যে পদ্যে বহু রচনা লিখিয়া অবশেষে স্বয়ং সেই জিনিসটা সমর্থন করিলেন কি করিয়া—বাণী ও জীবনের মধ্যে এ অসংগতি কেন, তাহার সদুত্তর নাই।"[৬৯] একই ঘটনা বিশেষ সংস্কারক কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয়। নাবালিকা কন্যার বিবাহদানের জন্য তিনি তাঁর সমাজে রীতিমত সমালোচিত। সেই প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে আমরা সতী প্রথা নিবারণ বা বিধবা বিবাহ বিষয়ক উদ্ধৃতি না পেলেও নারী স্বাধীনতার সার্বিক সুর লক্ষ্য করতে পারি। পর্দা প্রথা সরিয়ে তিনি নারীকে মানুষের দরবারে হাজির করেছেন। গৃহবধূ সারদাদেবীকে জয়রামবাটী হতে কলকাতা যাতায়াতে এবং দক্ষিণেশ্বরে পরিচিত ব্যক্তিদের বাড়িতে গতায়তে উৎসাহিত করেছেন। তাঁকে সঙ্গীত, নাটক, থিয়েটার, যাত্রা, পাঁচালি, কীর্তন—সমস্ত শুনতে উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ, তিনি মনে করতেন ঐ সমস্ত জিনিস লোকশিক্ষার উপাদান এবং ব্যক্তির সামাজিকীকরণের সহায়ক। নারীকে মহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার যে আন্দোলন তাঁর হাতে সংগঠিত হয়েছে তা অভিনব। সমকালীন সমাজে (যখন নারীরা সমাজপতিদের হাতে চূড়ান্ত মাত্রায় নিগৃহীত) তিনি শূদ্র নারীর (রাসমণি) অধীনে কর্মরত, নারীকে দীক্ষাগুরু হিসাবে বরণ করেছেন (ভৈরবীব্রাহ্মণী), শূদ্রাণী ধনী কামারণীকে ভিক্ষামাতা রূপে গ্রহণ করেছেন, বধূ সারদামণিকে লোকশিক্ষিকার মর্যাদা দান করে গেছেন; স্মরণীয় তাঁর অন্যতম আরাধ্য ঈশ্বরও এক নারী—মা ভবতারিণী! শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীপাঠক নিশ্চিত অবগত আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উপাসক নন; সকল ধর্মে তাঁর অবাধ গতায়ত ও বিহার। তবু তাঁর কণ্ঠে 'মা' ডাক। বস্তুতঃ নারীরূপকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানবীয় আকার হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সমকালীন পত্রপত্রিকার তথ্য বলে যে, কৌলীন্য ও বাল্য বিধবা কলকাতা পল্লীতে বিপুল সংখ্যায় বারবণিতাদের

উদ্ভব ঘটিয়েছিল।[৭০] সংস্কারকগণ সে যুগে বারবণিতাদের প্রসঙ্গে নীরব। তাঁরা কৌলিন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধের জন্য লড়েছেন। কিন্তু ঐ প্রথার জন্য যে সমস্ত নিরীহ নিরপরাধ অসহায় নারীদের ঐ অন্ধকার জীবন বেছে নিতে হ'ল তাদের কথা ভাববে কে ? এ প্রশ্ন শরৎচন্দ্রকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর দিতে সক্ষম হন নি। সে উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন। তাদের বলেছেন, 'মা'! তাই বারবণিতারাও স্পর্ধায় সাহস ভরে আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে হাজির হতে পারে। নারীকে তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজে সন্ন্যাসী হয়েও বিশ্বের কাছে সহধর্মিণী সারদাদেবীর উজ্জ্বলভাব নিয়ত প্রচার করে গেছেন। নারীদের উপযুক্ত শিক্ষায় পারদর্শী করতে তিনি শিষ্যা গৌরীমাকে কলকাতায় নারীসমাজ কল্যাণে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান। নারীকে কেবল শিক্ষিত করতেই তিনি উৎসাহী ছিলেন না, চেয়েছিলেন তাঁদের সমাজনেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে। রামকৃষ্ণ মিশনের অবিসংবাদী নেত্রী মা-সারদার সংঘজননী ভূমিকা তারই প্রমাণ।[৭১]

বিজ্ঞান অনুশীলন : শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে বিজ্ঞান অনুশীলন প্রত্যক্ষ ; তাঁর উপমা উপদেশের সিংহভাগ জুড়ে আছে বিজ্ঞানের নানা ঘটনা। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, গণিত, কারিগরিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ উপমায় অজস্র।[৭২] প্রযুক্তিবিদ্যায় তাঁর যে প্রগাঢ় আগ্রহ ছিল সমকালীন বিজ্ঞানসাধক মহেন্দ্রলাল সরকার (চিকিৎসক) ও রামচন্দ্র দত্তের (রসায়নবিদ্) সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে সে ইঙ্গিত বর্তমান। জাতিভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর কথায় 'ভক্তের জাত নেই'। তাঁর কাছে জাতি, কর্ম, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অবাধ গতায়ত ছিল। কুসংস্কারের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, ঈশ্বর লাভের জন্য পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রীয় বিধি, কৃচ্ছ্রসাধন, সংসারত্যাগ, জপতপ ও শুচিতার প্রশ্ন অপরিহার্য নয়। বলতেন, 'মনই সব ; মানুষ মনেতেই মুক্ত, মনেতেই বদ্ধ'। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতের ঋত্বিক! তিনি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সন্দেহ নেই—কিন্তু কঠোর যুক্তিবাদী। বলেছেন, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন ?' তাঁরই কথা, 'কলিতে বেদমত চলে না, কলিতে অন্নগত প্রাণ।'[৭৩] তিনি পাশ্চাত্য ভাষা ইংরাজী ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন, তাঁর পার্ষদরা ইংরাজীতে কথা বলুক। তাঁর পার্ষদদের প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। এই নমুনা তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহের নির্দেশক।

ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্ম নিরপেক্ষতার বেনজির দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। পুরোহিততন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বৈষ্ণব ও শক্তিসাধনার বিচিত্রপথ, ইসলাম থেকে খ্রিস্টসাধনা, দ্বৈত থেকে অদ্বৈত, সাকার থেকে নিরাকার, সগুণ থেকে নির্গুণ সকল সাধনায় সিদ্ধ হয়ে বিভেদ জর্জরিত পৃথিবীকে শোনালেন 'যত মত তত পথ'। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যুগন্ধর পুরুষরা যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণের ওপর নিজ নিজ মতামত দাঁড় করাতে ব্যস্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বললেন, "কলিতে বেদমত চলে না।" শাস্ত্রীয় মতামতের চেয়ে তাঁর কাছে উপলব্ধিই ছিল

শ্রেষ্ঠ! তিনি বলতেন, "জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ সবই সত্য তবে ভক্তিযোগই যুগধর্ম"। ধর্ম নিয়ে দলাদলিকে বললেন 'মতুয়ার বুদ্ধি'—এ ভাল নয়। তিনি আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি' বা দারাশিকোর 'মজম-উল-বইরেন' বা রামমোহনের 'ব্রাহ্মধর্ম' বা কেশবচন্দ্রের 'নববিধানে'র মতো কোন স্বতন্ত্র 'ধর্মমত' গঠন করে তার প্রচার করেননি। তিনি সব ধর্মমতে সাধনা করে সিদ্ধান্ত টানলেন সব ধর্মই এক সত্যের দিকে আগুয়ান। কাজেই ধর্মীয় কলহ নেহাতই অজ্ঞতাপ্রসূত হঠকারিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ব্যক্তিত্ব যিনি বিশ্বের সামনে অভিনব চ্যালেঞ্জ জানালেন : অন্যধর্ম গ্রহণ করলে কেউ ধর্মান্তরিত হয় না বা কেউ ধর্ম হারায় না। বরঞ্চ একাধিক ধর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকা বা চর্চায় অভিনিবিষ্ট থাকাই সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের লক্ষণ। বিশ শতকের শেষ দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক নেতারা যখন সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে তুলনামূলক ধর্ম চর্চার কথা ভাবছেন, শতবর্ষ পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তার উৎকৃষ্ট মডেল হিসাবে নিজেকে মানব সমাজের কাছে অর্পণ করে গেছেন। এহেন সমাজ বিপ্লবের নমুনা ইতিহাসে একাধিক নেই। তাঁর অগণিত ভক্তদের মধ্যে অজস্র মুসলমান, শিখ, জৈন, পারসিক, খ্রিস্টান রয়েছেন। সকলেই তাঁকে তাঁদের আপনজন ভেবেছে। খ্রিস্টানরা ভেবেছেন উনি তাঁদের 'খ্রিস্ট'। মুসলমানরা ভেবেছেন উনি তাঁদের 'পীর'! শিখরা তো সোচ্চারে বলেছিলেন, 'আপনি নানক'। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষা পরধর্মসহিষ্ণুতা শেখায়, পরধর্মে সম্প্রীতি বাড়ায়, মতান্ধতা ও ধর্মীয় উন্মত্ততা নিধন করে, সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে সোস্যাল কমিটমেন্টের সামিল করতে চেয়েছেন।[৭৪]

কৃষক সমস্যা প্রসঙ্গে: উনিশ শতকের নবচেতনার এক বিশেষ শর্ত সমকালীন কৃষক সমস্যার প্রতি সহমর্মিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন দর্শনে এ প্রত্যয়ের বিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৭৫] সমকালীন ব্রিটিশ রাজের শোষণ, মহাজনী বঞ্চনা ও জমিদারতন্ত্রের শোষণ সম্যক্ অবগত ছিলেন। জমিদার রামানন্দ রায়ের (রামকান্ত রায়) অত্যাচারে তাঁর পিতা জন্মভূমি থেকে উৎখাত হয়েছিলেন; উনিশ শতকে কৃষক শোষণের শীর্ষ ছিল জমিদারতন্ত্র। প্রজাদের ওপর নির্যাতন, অতিরিক্ত করভার চাপানো, তাদের সম্পত্তি ক্রোক করে নেওয়া সবেতেই হাত ছিল জমিদার শ্রেণীর। ইতিহাসের এই অবিবেচনার স্তম্ভকে চিনতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুল হয়নি। রানী রাসমণিকে প্রকাশ্যে চড় মেরেছেন, প্রভাবশালী জমিদার মথুরামোহনকে একাধিকবার মারতে ছুটেছেন ও ভর্ৎসনা করেছেন এবং রাজা সৌরীন্দ্র ঠাকুরকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, "তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা সেটা মিথ্যা কথা হবে।"[৭৬] রাণাঘাটের কলাইঘাটায় নিরন্ন কৃষকদের সমর্থনে সত্যাগ্রহ করেছেন এবং জমিদার মথুরামোহনকে বাধ্য করেছেন তাদের খাজনা মকুব করতে। তাঁর দেওঘরের সত্যাগ্রহ সর্বজনবিদিত। পর্যুপরি দু'বছর দুর্ভিক্ষ ঘটায় ঐ অঞ্চলের কৃষকরা দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধাম দর্শন করতে গিয়ে দর্শন করেছিলেন মানব দেবতাকে। তাই তাঁর কাছে 'চন্দন চর্চিত প্রস্তর প্রতিমা' বড় মনে হয়নি। তিনি

তাঁর সাধনার আসন করে নিয়েছিলেন সাঁওতাল পল্লীর 'নিরন্ন মানব প্রতিমার' কাছে। তিনি জমিদার মথুরামোহনকে বাধ্য করেছিলেন তাদের অন্নের ব্যবস্থা করতে। উনিশ শতকে কৃষক স্বার্থের অনুকূলে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু কোন আন্দোলনই সার্থকতার শীর্ষে পৌঁছাতে পারেনি; অধিকাংশ ধর্মের চোরাবালিতে ভণ্ডুল হয়েছে। এ মন্তব্য ঐতিহাসিকদের। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যাগ্রহ দরিদ্র কৃষক স্বার্থে কৃষকদের মাঝে তিনি নামিয়ে এনেছিলেন জমিদারকে। এ ঘটনার একাধিক নজির এ শতকে বিরল।

মানবিক মূল্যবোধ: শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম মানবতাবাদের ধর্ম[৭৭]; বলেছেন অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুতঃ জুলিয়ান হাক্সলী বর্ণিত 'Scientific Humanism' তথা বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের যথার্থ পথিকৃৎ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। মানবিক মূল্যবোধের যে প্রধান শর্ত মনন, মমত্ববোধ, ন্যায়বোধ, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, দায়িত্ববোধ, আত্মসমালোচনা, সমাজবোধ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষায় নিহিত। তিনি 'মন'কে কার্যকরী শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। বলতেন, 'মনই সব; মানুষ মনেতেই মুক্ত, মনেতেই বদ্ধ'। ভালবাসা ও মমত্ববোধের শিক্ষা পুনঃ পুনঃ দিয়ে গেছেন তাঁর পার্ষদদের। বলতেন, 'তোমরা সর্বদা প্রণয় করে থাকবে, তাতেই কল্যাণ'। পার্ষদদের জন্য দক্ষিণেশ্বর কুঠিবাড়ি থেকে তারস্বরে চিৎকার করে ডেকেছেন, 'তোরা কে কোথা আছিস আয়'। তাঁর ভালবাসার প্রত্যয় প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, 'He is love personified' অর্থাৎ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিমান প্রেম'।[৭৮] সহিষ্ণুতার শিক্ষা তাঁর কণ্ঠ থেকে নিয়ত নিঃসৃত হতো, 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী: রামকৃষ্ণ রাজনৈতিক চরিত্র নয়, কিন্তু বিশেষ সামাজিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তা-চেতনায় গণতান্ত্রিক আদর্শের সুর অনুরণিত। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা তাঁর বক্তব্যে না থাকলেও স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা লক্ষিত হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালিয়েছেন; দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ করেছেন। সামাজিক ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার প্রতিরোধ জানিয়েছেন তাঁর 'যত মত তত পথ'—ধর্মাদর্শের মাধ্যমে। তিনি যে যৌথ সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠান 'রামকৃষ্ণ মিশনের' কার্য প্রণালীতে তার দর্শন মেলে। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম গণধর্ম; তাঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি।'[৭৯] বস্তুতঃ তাঁর হাতেই ধর্মের প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে।

যুগচেতনায় ভারতীয় আদর্শ: ভারতাদর্শে যে বহুত্বের মধ্যে একতার আহ্বান, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, অনাক্রমতা, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্মচেতনা, পরসভ্যতা-আত্তীকরণ, ত্যাগাদর্শ, মনুষ্যত্বের চর্চা ইত্যাদি নমুনার সার্থক সাঙ্গীকরণ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

তিনি নানা ধর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করেছেন। ধর্মীয় মতান্ধতা ঘৃণা করেছেন। তাঁর সত্য নিষ্ঠা অপরিসীম। তিনি কোন কিছুর শর্তেই সত্যকে ছাড়তে রাজী ছিলেন

না। উপাস্যদেবীর পায়ে ফুল দিয়ে বলেছিলেন, "মা, এই নে তোর পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, ধর্ম-অধর্ম।" কিন্তু বলতে পারেন নি, 'এই নে তোর সত্য'।[৮০] তাঁর ত্যাগাদর্শ সুউচ্চ। জীবনের কোন কিছুই তাঁকে লোভাতুর করতে পারেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীপাঠকের নিশ্চয় স্মরণে আছে, লক্ষ্মীকান্ত মাড়োয়াড়ী প্রদত্ত অর্থ হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন, মথুরামোহন প্রদত্ত শাল ও মুদ্রা তাঁকে পীড়িত করেছে। শ্রী অরবিন্দ তাঁকে ভারতাত্মার প্রতিমূর্তি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে ভারতাদর্শ প্রতিপালনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন গবেষক-সন্ন্যাসী স্বামী সোমেশ্বরানন্দ তাঁর 'লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নতুন প্রতীক বিশিষ্ট নতুন ধর্ম বা কালের প্রবর্তন করেননি; কারণ তিনি জানতেন—কোন দেশের ধর্মের বহিরঙ্গে তথা প্রতীক বড় নয়; বড় লোকচেতনার সুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মাদর্শে লোকচেতনার সুর সদা ঝংকৃত। সেই উদ্যোগেই তিনি প্রাচীন ও নবীন উভয় সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন।[৮১]

সমাজতন্ত্রের সূচনা : সমাজতন্ত্রের সূচনা নবজাগরণীয় চেতনার উল্লেখ্য শর্ত বলেই কথিত। সেই প্রত্যয়ে মানুষের অধিকার, শ্রমিক সমস্যার ভাবনা, কৃষকসমস্যার ভাবনা, প্রলেটোকাল্ট, বিশেষাধিকার লোপ, ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্জন, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদ প্রমুখ শর্তের উল্লেখ আছে। সংশ্লিষ্ট শর্তের অনেকগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে না উল্লেখ থাকলেও ঐ প্রত্যয়ের বিশেষ কিছু নিদর্শন সেখানে বর্তমান।[৮২] কৃষক সমস্যার প্রসঙ্গে তাঁর সচেতনতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তিনি ছিলেন জাগ্রত প্রতিবাদ। মুচি, মেথর, বেশ্যা, কৃষক, শ্রমিক সকলকে আপন বলে কাছে টেনেছেন। সকলকেই সমান মর্যাদায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিশেষাধিকার তিনি কাউকেই দেননি। জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকেই অকুণ্ঠ চিত্তে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।[৮৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ঐতিহাসিক উক্তি নিশ্চয় সকলেই অবগত আছেন —"জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, অজ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ব্রহ্মবাদীদের চরণে প্রণাম"। তাঁর উক্তিতে আগাগোড়াই মানুষের কথা। তাঁরই ভাষ্য: "মানুষ কি কমগা![৮৪] ঈশ্বর সবেতেই আছেন তবে মানুষে তার প্রকাশ বেশী।" তিনি বলেছেন, "মাটির প্রতিমায় পূজা হয়—আর মানুষে হবে না!" শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীকার শশিভূষণ ঘোষ জানিয়েছেন যে, তাঁর ভাষায় যে গ্রাম্যতা ছিল (যে কারণে তিনি সমকালীন তথাকথিত সভ্যসমাজে সমালোচিত হয়েছিলেন) তা গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সমব্যথী হওয়ার নিদর্শন।[৮৫]

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: পরাধীন দেশের জাতীয়তাবাদী জাগরণে দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এক আবশ্যিক শর্ত। এ মন্তব্য ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে—যা ইতিহাসে 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামের চরমপন্থী' পর্ব বলে কথিত। ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাসঙ্গিকতা

আলোচনায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যান্য শর্ত সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ সহমর্মিতা দেখানো হবে। জাতীয়তা জাগরণের আবশ্যকীয় শর্ত—জনসংযোগ, স্বদেশপ্রীতি, দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্রমুখ চেতনা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যয়ে অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল ছিল। বস্তুবাদী ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "যে ধর্ম সংস্কারে রামকৃষ্ণ ব্রতী হন সেখানে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সব সমান ; সবাই মায়ের সন্তান। তখনকার সমাজের হাওয়ার সঙ্গে এই ধর্মীয় সাম্যবাদ সহজেই সঙ্গতি খুঁজে পেল। জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত মানুষকে একমায়ের আহ্বানে সামিল করে, রামকৃষ্ণ তখনকার সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই ঐক্যবোধ সেদিনকার জাতীয় আন্দোলনে ছিল এক পরম সম্পদ।"[৮৬]

বিশশতকের শুরুতেই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে ভিত্তি করে যে 'সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ' গড়ে উঠেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা) প্রমুখ। এঁদের সকলের ওপরই স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের দুর্নিবার প্রভাব ছিল। স্বামীজির বজ্রবাণী : 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরিয়সী ভারতমাতাই তোমাদের আরাধ্যা দেবতা হোক[৮৭]—ছিল সে যুগের বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। সে স্বীকৃতি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের লেখনীতে উজ্জ্বল। ব্রহ্মমাধব উপাধ্যায় বলেছিলেন, "আমরা জানি বা না জানি, নবীন প্রবীণ আমাদের সকলের পিছনেই রয়েছে ঐ সাইক্লোনিক বিরাট মানুষটি (স্বামীজী)। সে-ই আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাগরণের পিতা। আর পরমহংসদেব হলেন সেই জাগরণের পিতামহ।"[৮৮]

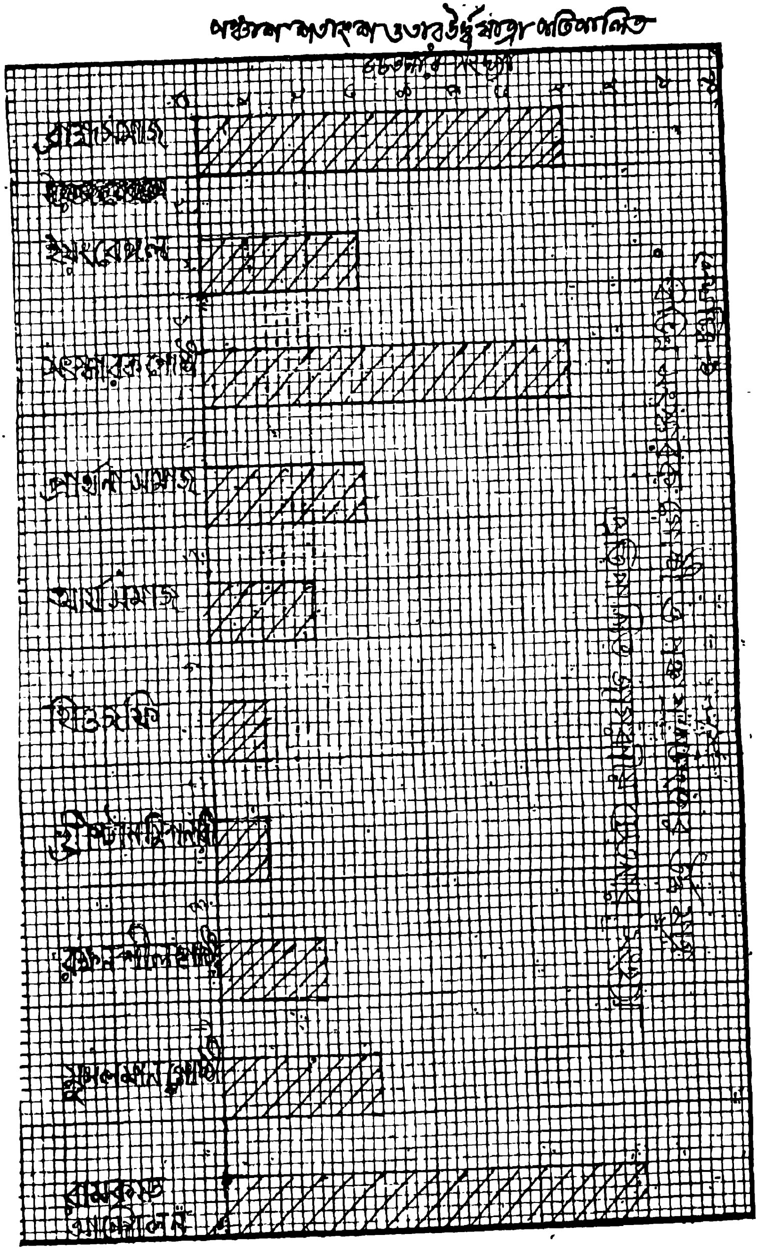
আন্তর্জাতিক প্রত্যয় : আন্তর্জাতিক সাম্য, আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি শব্দের আমদানী বেশীদিনের নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন না ; তাঁর ভাব ভাবনায় আন্তর্জাতিকতাবাদ থাকার প্রসঙ্গে অনেকেই বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমরা বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করব শ্রীরামকৃষ্ণচেতনায় আন্তর্জাতিক প্রত্যয়ের সুর।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, "দেখগা, আমি একদেশে গেছলুম—সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কি ভক্তি।" আজ আর পাঠকদের প্রমাণ দেখানোর আবশ্যকতা নেই যে, রামকৃষ্ণ চেতনা বিশ্বের সর্বত্র বহমান। এ যুগের প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ পিতিরম্ এ সরোকিন লিখেছেন, "বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জীবনে দুটি প্রধান আন্দোলন চোখে পড়ে, প্রথমটি হল, পশ্চিমী মানুষের প্রাচীন জীবনের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ আর দ্বিতীয়টি হল, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তার ক্রমবর্ধমান প্রসার।"[৮৯]

সারণী—১

উনিশ শতকের নবচেতনায় বিভিন্ন সংস্কারকগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কার মাত্রা (শতাংশে প্রকাশ)

নবজাগরণ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী	নারীজাগরণ	বিজ্ঞান অনুশীলন	ধর্ম নিরপেক্ষতা	কৃষক সমাচার সচেতনতা	মানবিক মূল্যবোধ	গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস	যুগচেতনায় ভারতীয় আদর্শ	সমাজতন্ত্রের সূচনা	আন্তর্জাতিক ভাবনা	জাতীয়তা-বোধের জাগরণ
১। ব্রাহ্ম সমাজ	৬০.০০	৫০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৭০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৩০.০০	৭০.০০	৫০.০০
২। ইয়ংবেঙ্গল	৬০.০০	৪০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৩০.০০	৪০.০০	১০.০০	৩০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৩। সংস্কারকগোষ্ঠী	৪০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৫০.০০	৭০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৪০.০০	৬০.০০	৫০.০০
৪। প্রার্থনাসমাজ	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	—	২০.০০	৪০.০০	৩০.০০	৪০.০০	২০.০০	২০.০০
৫। আর্যসমাজ	৩০.০০	২০.০০	২০.০০	—	৩০.০০	৫০.০০	৩০.০০	২০.০০	২০.০০	৫০.০০
৬। থিওজফি	৩০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১০.০০	২০.০০	৫০.০০
৭। খ্রিস্টান মিশনারী	৪০.০০	৫০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৪০.০০	২০.০০	১০.০০	৩০.০০	২০.০০	২০.০০
৮। রক্ষণশীলগোষ্ঠী	২০.০০	৩০.০০	১০.০০	২০.০০	৫০.০০	১০.০০	৫০.০০	২০.০০	১০.০০	৪০.০০
৯। মুসলমান সমাজ	৩০.০০	৫০.০০	২০.০০	৫০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২০.০০	৫০.০০
১০। রামকৃষ্ণ আন্দোলন	৬০.০০	৭০.০০	৯০.০০	৪০.০০	৭০.০০	৫০.০০	৮০.০০	৪০.০০	৭০.০০	৬০.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের সাধক ; মন্দির, গীর্জা, মসজিদ সর্বত্রই তাঁর গতায়ত অবাধ ছিল। তাঁর ঐ সমন্বয়ী প্রবণতা—বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রতি তার সহমর্মিতাকে ব্যক্ত করে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই বলেছিলেন, 'বাবু সাজতে পারব না।' সমকালীন সমাজে 'বাবু কালচার' সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরই নবতম রূপ। উনিশ শতকের কলকাতায় বাবু সম্প্রদায় ছিল মধ্য স্বত্বভোগী জমিদার—যারা অন্যের ওপর গ্রামের জমি দেখভালের ভার দিযে বিলাসে জীবন কাটাত কলকাতায়। জমির চাষীকে শোষণ করে তার ফসল বিক্রির অর্থেই চলত তাদের বিলাস-ব্যসন।

আন্তর্জাতিকতাবাদের উপশর্ত হিসাবে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও সার্বভৌমিকতাও তাঁর ধর্ম-দর্শনের ভিত্তি। ধর্মীয় সমাজতন্ত্রিক চেতনা ও আন্তর্জাতিক নৈতিকতারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বশান্তি' শিরোনামী আলোচনায় লেখক বিশ্বশান্তি প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষানুসারী এক যুক্তিগ্রাহ্য মডেল উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। ঐ মডেল অনুযাযী বিশ্বশান্তি স্থাপনের যে কার্যকরী কর্মসূচী (বিভিন্ন স্তরে আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, আত্মিক মানুষের যুক্তি) নেওয়া হয়েছে, তা বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাদর্শেরই প্রতিধ্বনি! আন্তর্জাতিক সাম্য স্থাপনে আজও সমান জরুরি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মহতী বাণী: "মন-মুখ এক কর', 'যত মত তত পথ', 'মান হুঁশ হও', সর্বোপরি 'তোমাদের চৈতন্য হোক।"

উপসংহার: আগের অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি জাগরণীয চেতনার সমস্ত শর্তই শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা নির্দেশে নিপুণভাবে প্রতিপালিত। জাগরণীর চেতনার আনুকূল্য জ্ঞাপক চিত্রে (শতকরা পঞ্চাশ শতাংশের অধিক উপশর্ত পরিপুষ্ট) লক্ষ্য করা যায় যে, উনিশ শতকের সংগঠিত নানা সংস্কার আন্দোলনেব মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনেই অধিক সংখ্যক শর্ত প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট। কাজেই ভারতীয নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা প্রশ্নাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে মনীষী আমোরি ডি রিন কোর্টের উক্তি যথার্থই :

"ভারতীয় জনজীবনে উনিশ শতকের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন বিশ্বজাগরণীর চেতনার মহাগুরু।" রম্যাঁ রোলাঁ লিখেছেন, "বিশ্বজগতের যন্ত্রণা রামকৃষ্ণকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিল। তাঁর চৈতন্যের অতি কোমল ত্বকে জগতের সমস্ত বেদনা খোদাই হয়ে গিয়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আধুনিক বিশ্বের আবশ্যিক পাঠ। টয়েনবির কথা সর্বতোভাবে সত্য :

"মানব ইতিহাসের এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে মানবজাতি রক্ষা পেতে পারে একমাত্র ভারতীয় পথে। সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি ও শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বযের প্রামাণিক সাক্ষ্য—এগুলিতে আমরা পেতে পারি সেই মানসিকতা ও সেই ভাবাদর্শ, যা সমগ্র মানবসমাজকে একখণ্ড পরিবাররূপে গড়ে তোলা সম্ভব করতে পারে এবং এই পথই পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে আমার আত্মবিলোপের একমাত্র বিকল্প।"

তথ্যসূত্র :

১. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থীপর্ব— অমলেশ ত্রিপাঠী ; পৃঃ ১-১১৩৩
২. ঊনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক (সংক্ষেপে তর্ক ও বিতর্ক) সম্পাদিত : নরহরি কবিরাজ, পৃঃ ১-৩২৪
৩. আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ—বিপান চন্দ্র, পৃঃ ২৪৩-৭৭
৪. তর্ক ও বিতর্ক, পৃঃ ১-৩২৪
৫. তদেব
৬. ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ—সুকোমল সেন (সংক্ষেপে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ)
৭. শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতীয় নবজাগরণ—জীবন মুখোপাধ্যায়
[বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ : সম্পা : স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও চৈতন্যানন্দ, পৃঃ ১৫৩-৭৭
৮. আধুনিক ভারতের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৪৭ : গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১৮৪
৯. তত্ত্ববোধিনী, অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শকাব্দ
১০. অর্থনীতির পথে—ভবতোষ দত্ত, পৃঃ ২২
১১. ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ—পৃঃ ২০১
১২ তর্ক ও বিতর্ক—পৃঃ ১৩৬
১৩. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২০১
১৪. তর্ক ও বিতর্ক—পৃঃ ১৩৬
১৫. তদেব
১৬. আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃঃ ৮৫-৯০
১৯. Indian Renaissance: Rammohan to Vivekananda- Purakait, p-22
২০. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস—স্বপন বসু, পৃঃ ৪৯
২০. তর্ক ও বিতর্ক, পৃঃ ৩৫
২২. আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃঃ ৯৬
২৩. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২০৪
২৪. তর্ক ও বিতর্ক, পৃঃ ২৩৩
২৫. ঊনিশ-বিশ—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩৬
২৬. বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২২
২৭. Indian Renaissance, pp.32 33
২৮. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২১০
২৯. তর্ক ও বিতর্ক, পৃঃ ৮৬
৩০. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি—এ.আর. দেশাই, পৃঃ ২৫২ (সংক্ষেপে—সামাজিক পটভূমি)
৩১. আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃঃ ১৯১
৩২. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২১৫
৩৩. তদেব, পৃঃ ২১৬
৩৪. Indian Renaissance, p.121
৩৫. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২১৬
৩৬. The Missionaries and the Plantess: The Hindoo Patriot· 24.5.1857

৩৭. সামাজিক পটভূমি, পৃঃ ২৯১-৯৯
৩৮. বাংলা নবচেতনার ইতিহাস, পৃঃ ৫৮-৬৪
৩৯. আধুনিক ভারতের ইতিহাস—প্রণব চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৮
৪০. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২২৪
৪১. আধুনিক ইতিহাস, পৃঃ ১৩৮
৪২ ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২২৪
৪৩. তদেব
৪৪. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৩য়)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ৩১৩
(সংক্ষেপে সমকালীন)
৪৫. Social and Religions Reform Movement in India in 19th & 20th Centuries Ed. p.201
(In short · Reform Movement)
৪৬. সামাজিক পটভূমি, পৃঃ ২৫৪
৪৭. সমকালীন, পৃঃ ৫৪ ; সামাজিক পটভূমি, ২৫৫
৪৮. উনিশের শতকে নব্যহিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক—সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৮-২৯
(সংক্ষেপে: নব্যহিন্দু আন্দোলন)
৪৯. তদেব
৫০. সমকালীন, পৃঃ ৫৮-৬৩
৫১. Reform Movement, p 338
৫২. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২৪৬-৫৬
৫৩. সামাজিক পটভূমি, পৃ: ২৬১
৫৪. তদেব ২৫৮
৫৫. তদেব, পৃ: ২৬০
৫৬. ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ—সুকোমল সেন, ১৯৯২, পৃঃ ২৫৪
৫৭. আধুনিক ভারতের ইতিহাস—গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৬ পৃঃ ১৬৯
৫৮. ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃঃ ২৫০
৫৯. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ, পৃ: ২৫০-৫৬
৬০. নব্য হিন্দু আন্দোলন, পৃঃ প্রস্তাবনা
৬১. তর্ক ও বিতর্ক, পৃঃ ১৫৭-২১৮
৬২. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃঃ ১৭৯
৬৩. ঊনিশ শতকের গণ অসন্তোষ—স্বপন বসু, পৃঃ ১১৪
৬৪. ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃঃ ২৬
৬৫. তদেব, পৃঃ ১৯৯
৬৬. আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃঃ ২৯২
৬৭. ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ পৃঃ ২২৭
৬৮. তদেব

৬৯. রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০
৭০. শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাত্যজন—তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১
৭১. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩৭৪
৭২. শ্রীরামকৃষ্ণ মননে বিজ্ঞান—তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১
৭৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম : ১/২/৯
৭৪. লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ পৃঃ ১১৮-৩৪
৭৫. ঊনিশ শতকের কৃষক আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ—তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজশিক্ষা—আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা, ১৯৯৬
৭৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২/১/১
৭৭. ঊনিশ-বিশ
৭৮. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৬২৮
৭৯. তদেব, পৃঃ ৮৬৬-৭০
৮০. তদেব, পৃঃ ৮৬৬
৮১. লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ১৩৫
৮২. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ১৬০
৮৩. শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাত্যজন
৮৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৫/১৫/৪
৮৫. শ্রীরামকৃষ্ণদেব—শশিভূষণ ঘোষ, পৃঃ ২১
৮৬. আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃঃ ১৯১
৮৭. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ : সম্পাঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, পৃঃ ২৬৪
৮৮. তদেব, পৃঃ ৯৪৫
৮৯. তদেব, পৃঃ ২৫৬
৯০. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১/১৩/৫

এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ

উনিশ শতকের জাগরণ ভাবত-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির নেপথ্যে এক ধারাবাহিক সংগ্রামের কথিকা আছে—যা শুরু হয়েছিল রামমোহনের হাতে এবং পরিণতি পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলমে। এই সংগ্রামী ইতিবৃত্ত নিয়ে বিস্তর বাগ্-বিতণ্ডা ঘটেছে। এর মূল্যায়ন নিয়ে ঐতিহাসিকরাও বিভিন্ন সময় দ্বিধাগ্রস্ত।

উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলন এক বহুল-আলোচিত অধ্যায় এবং সেই ইতিবৃত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত।[১] উনিশ শতকের জাগরণে একাধিক ব্যক্তির নিরলস শ্রমও একাধিক সংস্কার-আন্দোলনের ফল হিসাবে চিহ্নিত। মানবমুক্তির সেই মহান যজ্ঞে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কেবল ধর্মের নিগড়ে বাঁধা ছিল না। 'ধর্ম' তাঁর কাছে 'প্রথানুগ আচার হিসাবে' দেখা দেয়নি। মানব-প্রকৃতির মহান আদর্শ হিসাবেই তাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এবং সেই প্রত্যয়ের প্রসার ঘটিয়েছেন সমাজ-জীবনের সকল স্তরেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-চেতনা আজ বিশ্বের তাবৎ চিন্তাবিদ্‌দের বিশেষ আলোচনার বিষয়। সেই সত্যের মুখোমুখি হযেই আমরা ইতিহাসের সেই উজ্জ্বল অধ্যায়কে উপস্থিত করতে চেয়েছি—যাতে সেখান থেকে আজকের সমাজ-বিপন্নতা উত্তরণের কোন সমাধান সূত্র পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমি:

উনিশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমি আঁকতে গেলে যে মুখ্য শর্তগুলি স্মরণ আবশ্যক তা হ'ল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মতান্ত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। এই পটভূমিতে আমরা লক্ষ্য করবো ব্রিটিশ-শাসন তখনও এদেশে অটুট আছে এবং জোরালো মুষ্টিতে।

'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'—কবি-কথা তখন সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ-শাসক এদেশীয় শিল্পের শ্মশান-শয্যা গ'ড়ে বিদেশী পুঁজির স্থায়ী আমানত গড়তে ব্যস্ত। কলকাতার বাজার তখন বিদেশী পণ্যে ভরপুর। গ্রাম-বাংলার কুটিরশিল্প ধ্বংসের যন্ত্রণায় অধীর—আর কুটিরশিল্পীরা দারিদ্র্যের পীড়নে পিষ্ট।

ভারতীয় অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। সেখানেও খেটে খাওয়া জনসাধারণ ছিল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারির শোষণের শিকার। তারা ছলে, বলে, কৌশলে রায়তের সম্পত্তি হস্তগত করতে—জোর ক'রে খাজনা আদায় করতে—সবরকম

শাসন-শোষণ-যন্ত্রকে বহাল-তবিয়তে চালাতো। বস্তুতঃ তাদের স্বেচ্ছাচারিতার সব রসদ আসতো খেটে-খাওয়া কৃষকদের শ্রমজাত অর্থ থেকে, অথচ তারা যে তিমিরে—সেই তিমিরেই দিনাতিপাত করতো।

এর ওপর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শাসক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জোরে জমিকে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র ক'রে তুললো। চাষী ও জমিদারদের মাঝে সৃষ্টি হ'ল বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী (পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার প্রমুখ)[২]। এই মধ্যস্বত্ব জমিদারবাবুরা থাকতো শহরে আর জমিদারি ইজারা দিতো অন্যজনকে। চাষীর সঙ্গে এ জাতীয় জমিদারদের কোন সম্পর্কই থাকতো না। ফলে একদিকে যেমন দেশীয় কৃষি-অর্থনীতি বিপর্যস্ত হ'ল—অন্যদিকে উপনিবেশিক শাসক ভারতবর্ষকে রপ্তানীকারক দেশ থেকে আমদানীকারক দেশে রূপান্তরিত করলো।[৩] ব্রিটিশ-শাসক তখন কেবল দেশীয় কাঁচামাল রপ্তানী করেই ক্ষান্ত নয়, আমদানী করলো যাবতীয় বিদেশী শিল্পসম্ভার। সেই শিল্পসম্ভারে শহর ভরে উঠলো। এহেন শোষক শাসক ব্রিটিশরাজকে তথাকথিত প্রতিবাদী ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুগোষ্ঠী উভয়েই—সশ্রদ্ধ চিত্তে ভক্তি দেখিয়েছে, তোয়াজ করেছে।[৪]

এইভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনে জনগণের দুই শোষণযন্ত্র—জমিদারতন্ত্র ও বাবুসমাজের (কলকাতার হঠাৎ-নবাবের দল) আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই উপনিবেশিক শাসনের নয়া অর্থনীতির পরিকল্পনায় পুষ্ট হয়েছিল বাঙালীবাবুসমাজ[৫], যারা ছিল দেওয়ান বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্মে অর্থবান[৬] অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাণিজ্যিক কারবারে লগ্নি শিল্পপতি[৭] অথবা মধ্যস্বত্বভোগী হঠাৎ নবাবের দল ; এরা ঘটা ক'রে মাতৃশ্রাদ্ধ করতো, লক্ষ টাকা খরচ ক'রে বিড়ালের বিয়ে দিতো, কাঙালী বিদায় করতো, দুর্গাপূজায় বাঈ নাচাতো। এই মুচ্ছুদ্দিগিরি পাবার জন্যে সেকালে লোকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে ইতস্তত করতো না।[৮]

ধর্মীয় ঘাতপ্রতিঘাতের জের পড়েছিল অচলায়তন মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে এই শতকে। সমাজে তখন জাতপাতের বড় জোর ; কৌলিন্যপ্রথার দুর্বার দাপট ; দেশাচারই ছিল আইন ও ধর্ম। আর নারীর অবস্থা ছিল 'ক্যাপটিভ লেডি'—সে কেবল সমাজের উৎপীড়ন, অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার।

শতকের ধর্মচেতনার ইতিহাস বড়ই জটিল আবর্তের পুঞ্জ। শতকের শুরুতে দেশীয় হিন্দুধর্ম অনাচার ও বীভৎসতায় পূর্ণ। ধর্মের নামে সতীদাহ, বহুবিবাহ, ইত্যাদি প্রথা তো আছেই—সেই সঙ্গে দুর্গাপূজায় বাঈ-নাচ, রাসযাত্রায় অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ ; স্নানযাত্রায় যুবতী স্ত্রী বাঁধা রেখে জুয়া খেলা, শাক্তদের বামাচার, ব্রাহ্মণদের অনাচার—এমন বহু অমানবিক কর্ম ধর্মের নামে চলতো অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই।[৯] এই গোষ্ঠীকে রক্ষণশীল হিন্দু ব'লে চিহ্নিত করা যায়। হিন্দুধর্মের এই ম্লানুময় মুহূর্তে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রয়াসে দেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। তার পরিপূরক প্রতিবাদী সমুন্নত হিন্দুধর্মরূপে ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব। পরবর্তী চিন্তাচেতনার ভিন্নতার ব্রাহ্মধর্ম তথা ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত। এখানেই এর শেষ নয়। শতকজুড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাক্-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক, কখনো রক্ষণশীল হিন্দু বনাম ব্রাহ্ম,

কখনো ব্রাহ্ম-বনাম খ্রিস্টান, কখনো রক্ষণশীল হিন্দু বনাম খ্রিস্টান।

শতকের সাংস্কৃতিক চালচিত্রেব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে দেখা যাবে, শতকের প্রথমার্ধে সংস্কৃতি বলতে পালাগান, হরিসভা, কথকতা, পাঁচালি, তর্জা ইত্যাদি। শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই উন্নত সাংস্কৃতিক প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। কলকাতার নাট্য আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট বঙ্গরঙ্গমঞ্চ এবং বাংলা নাটাকাভিনয়ের সূত্রপাত এই শতকের সাতের দশকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিবাদী চেতনা :

উনিশ শতকের সমাজে যখন বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর দলাদলি এবং রক্ষণশীল হিন্দু-গোষ্ঠী যখন আচার-সর্বস্বতা নিয়ে মগ্ন এবং ধর্ম বলতে বুঝতো তীর্থ-ভ্রমণ, ব্রত-উপবাস, গঙ্গাস্নান-জপ-তপ, পূজা-ভজন ইত্যাদি,—শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঘোষণা করলেন, প্রথা ধর্ম নয়—ধর্ম কোন জাদু নয়। তাঁর মতে ধর্ম হ'ল সেই সত্য যা মানুষকে 'চৈতন্য' দান করে। মানুষকে 'মান-হুঁশ' করে[১০] তাই তাঁর সানন্দ ঘোষণা লক্ষ্য করা যায় : 'সত্য ছাড়তে পারবো না।'[১১] পরবর্তীকালে সেই প্রত্যয়ে অন্বিষ্ট হতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তাঁর পার্ষদ ও ভক্তজনদের। ধর্মের নামে দলাদলিকে বলেছেন 'মতুয়ার বুদ্ধি'— 'এ বুদ্ধি ভাল নয।'[১২]

সাম্প্রদায়িক কলহকে থুৎকার দিয়েছেন ; লোকের চোখে চিহ্নিত হিন্দুসাধক হয়েও খ্রিস্টানদের চার্চে গেছেন যীশুর ভজনায়। মসজিদে নমাজ পাঠ করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। ধর্মের লোক হয়েও বামাচার, হঠযোগ, ঝাড়ফুক, গুরুগিরিকে ধিক্কার দিয়েছেন। ধর্মের নামে কঠোরতা বা নৃশংসতা ঘৃণা করেছেন। পরিশেষে ধর্মের আধুনিকতম ব্যাখ্যার সংস্থাপন ক'রে ঘোষণা করলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য—'নর-কে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করা'।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উনিশ শতকে যে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ জমিদার-গোষ্ঠী-মধ্যস্বত্বভোগী, যারা সমাজের শোষক যন্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ধিক্কার ঝরে পড়েছে বার বার। জমিদার সৌরীন্দ্রমোহন ও মথুরামোহনের মুখের ওপর বলেছেন 'বাবু বলতে পারব না, কারণ সেটা মিথ্যা কথা।'[১৩] এই তিনিই রাণী রাসমণির বেতনভুক্ কর্মচারী হয়েও তাঁকে চড় মারতে ইতস্তত করেননি। সর্বোপরি উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সমাজে সীমাহীন অনৈতিকতা ও চরম ভোগবাদের দিনে তিনি ধন-মান-আভিজাত্যের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন, 'কামিনী কাঞ্চনের দাস হতে পারব না।'[১৪] শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে টাকা-মাটি দুই-ই ছিল সমান। তিনি বলতেন টাকা হলেই মানুষ পাল্টে যায়—সে আর মানুষ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণকথিত 'কাঞ্চনের দাস'—উল্লিখিত বক্তব্যেরই দ্যোতনা। তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত ঘোষণা 'কামিনীর দাস হব না' বলতে সমকালীন সমাজে ভ্রষ্টাচার, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি দেহ-সম্ভোগী চেতনার ও নারীশক্তির অবমাননার বিরুদ্ধে তাঁর জাগ্রত প্রতিবাদকে ব্যক্ত করে।[১৫]

উনিশ শতকে রাজনৈতিক প্রবাহ হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসক ও তাঁর ক্রিয়াযন্ত্রই ছিল সর্বাপেক্ষা সরব। কলকাতা নগরী বাবু-কালচারের পীঠস্থান। তার ইঙ্গিত আমরা

প্রথমেই ব্যক্ত করেছি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে 'বাবু কালচার'—দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলেও এর নিয়ন্তা ছিল ব্রিটিশ-শাসক। সেদিনের হঠাৎ-বাবুরা বা পরবর্তীকালের দেশীয় রাজনৈতিক নেতারাও এই সত্যানুসন্ধানে সক্ষম হননি। এ অভিমত ঐতিহাসিকদের[১৬]। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিহাসের এ বঞ্চনার স্তম্ভকে চিনতে ভুল করেননি। তিনি শহরের জ্ঞানী-গুণীদের মুখের ওপরই বলেছিলেন, 'বাবু সাজতে পারবো না'।[১৭] অর্থাৎ ঔপনিবেশবাদের নয়া অর্থনীতির তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদলেহনে তিনি পরাঙ্মুখ। তাঁর এই আপসহীন প্রতিবাদ তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছেন। তখনকার দিনে ব্রিটিশরাজের লোভনীয় চাকুরী—'ডেপুটি' পদে বৃত হওয়া ; এহেন সাফল্যকেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাল চোখে দেখেননি ; বলেছেন, 'তোদের উদ্দেশ্য তো ডেপুটিগিরি'। বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নত ক'রে চাকুরীবৃত্তিকে বলেছেন, 'বুট জুতার গোঁজা।'[১৮]

কখনো বা বলেছেন 'একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর একদিকে মনিবের দাস'।[১৯] অথচ যারা স্বাধীন ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করে—তাদের তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। আগ্রাসী ব্রিটিশরাজের প্রতি তাঁর এরূপ প্রতিক্রিয়ার আরো নজির পাওয়া যায়। ব্রিটিশ-পদলেহী ভারতীয়দের গৃহকক্ষে শোভিত ধনী, রাজা, কুইন, কুইনের ছেলে বা ভ্রমণরত সাহেব-মেমদের ছবি দেখে অস্বস্তি পেয়েছেন এবং গৃহকর্তার নিন্দা করেছেন।[২০]

সমাজজীবনেও তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত করে পড়েছে। যে সমাজ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আচারীয় অনুশাসনে মন্দগতি, শ্মশানভূমে পরিণত হচ্ছিল—সেই পটভূমিতে তিনি জানালেন, চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা শিখতে পারবেন না।[২১] নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও পুরোহিততন্ত্রের মূলে কুঠার-আঘাত হানতে তিনি দ্বিধাকাতর হননি। ব্যক্তি জীবনে জাতিভেদ মানেনি[২২] ; ব্রাহ্মণের বর্ণসূচক উপবীত ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হননি।[২৩] খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিয়ে ভাবেননি ; বরঞ্চ ভক্তদের বলেছেন, 'যাদের শুচিবাই তাদের জ্ঞান হয়না'—'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি কোরো না'।[২৪]

আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন, উনিশ শতকের কোন সংস্কারক যা ধর্মপ্রচারক বা রাষ্ট্রনায়ক যখন ধর্মীয় উন্মাদনাকে আঘাত করতে ইতস্তত বা ভীত তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, 'কলিতে বেদ মত চলে না', 'নবাবী আমলের মুদ্রা বাদশাহী আমলে চলে না'।[২৫] এইভাবে সামাজিক জীবনে দেশীয় শিক্ষা ও সমাজচেতনার কূপমণ্ডুকতাকে ঝেড়ে ফেলে পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্তীকরণের উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

শতকের সাংস্কৃতিক শৈথিল্য ভাঙতে সংস্কারকগণ উদ্যোগী হলেও তাঁরা বহু সীমাবদ্ধতার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছুতে পারেন নি। সেক্ষেত্রেও তিনি জাগ্রত প্রতিবাদ। মনে-প্রাণে সন্ন্যাসী হয়েও বলেছেন, 'শুট্‌কে সাধু হবো না'।[২৬] দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মীয় সাধনায় মগ্ন থেকেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আগ্রহভরে শুনেছেন ; ইংরাজীতে কথোপকথন শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ;

সার্কাসে, মিউজিয়ামে, চিড়িয়াখানার বিভিন্ন বস্তু দেখে আনন্দিত হয়েছেন ; দিনের ব্যস্ততার মধ্যেও যাত্রা, থিয়েটার দেখতে গেছেন অত্যন্ত ব্যাকুলতা নিয়ে।[২৭] বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। উনিশ শতকের সমাজে তখন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো জ্ঞানীগুণীজন বাংলা-থিয়েটার থেকে দূরে থাকলে[২৮] (যেহেতু তখন থিয়েটারে স্ত্রী-চরিত্রে পতিতারা অংশ গ্রহণ করতো)। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নাটক ও নাটকের পাত্র-পাত্রী সকলকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাদের আশীর্বাদও করেছেন। উনিশ শতকে এ এক বেনজির দৃষ্টান্ত। ন্যাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র থিয়েটার ছেড়ে দেবার মনস্থ করলে তিনি তাঁকে নিষেধ করেছিলেন ; কারণ তার মধ্যে লোকশিক্ষা হয়।[২৯] যাত্রাভিনেতা 'বিদ্যাসুন্দর'কে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ দিয়ে পূর্ণোদ্যমে অভিনয়শিল্পে মগ্ন থাকতে বলেছেন ; ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা দেখতে চেয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে তিনি যেন দায়বদ্ধ ছিলেন। বলতেনঃ 'যে ভাল গায, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যা খুব ভালরকম জানে, তার ভিতরও সার আছে—ঈশ্বরের শক্তি আছে।'[৩০]

উপসংহার :

আজ যখন বিশ্বব্যাপী বিপন্নতা—বাতাসে বারুদের গন্ধ—বর্ণ-বৈষম্যবাদের নিদারুণ কোলাহল—সাম্প্রদায়িকতার রক্তাক্ত মিছিল—মাদকাসক্তির ভয়াবহতা—ইত্যাদি প্রকারের ঘন কালোমেঘ ইতঃস্তত, তখন বড ক'রে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, যিনি ধর্মের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ধর্মীয় ভাষায ধর্মের কথা যত না বলেছেন তার অনেক বেশী বলেছেন ও করেছেন মানুষের সুখের জন্য, নিরাপত্তার জন্য—শান্তির জন্য ! আমাদের দেখার অস্পষ্টতা, বুদ্ধির দীনতা, অনুভবের অক্ষমতায় আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা ও চেতনার সঠিক মূল্যায়ন ও অধিকরণে এখনও পশ্চাদ্‌পদ। আজকের যন্ত্রণাক্ষত দুর্দিনে আমরা ধীরভাবে কান পাতলে হয়তো ইথার-তরঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেই প্রতিবাদী-কণ্ঠস্বর এখনও শুনতে পাবো : 'মনে রেখো—যুদ্ধ নয় শান্তি—বিবাদ নয়, সহায়তা—শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী।'[৩১]

তথ্যসূত্র :

১. 'Social and Religious Reform Movement in the Nineteenth and Twentieth Centuries', Ed: S.P. Sen, Institute of Historical Studies, Cal, p. 12-14

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দু পুনরুভ্যুত্থান আন্দোলন : একটি বিতর্ক

উনিশ শতকের ইতিহাসে হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের প্রসঙ্গ বিভিন্ন ঐতিহাসিক কর্তৃক বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঐ উদ্যোগ যেমন ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল,[১] তেমনি তার সঙ্গে বহু প্রতিক্রিয়াশীল চেতনার আমদানি ঘটেছিল[২] যার খেসারত আজও সমাজকে দিতে হচ্ছে। হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের মূল্যায়ন করা এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন নেতৃত্বে রামকৃষ্ণকে সংশ্লিষ্ট করার যৌক্তিকতা বিচার। যেহেতু হিন্দু পুনরুভ্যুত্থান আন্দোলনকালেই রামকৃষ্ণের আবির্ভাব, যেহেতু হিন্দু ধর্মপীঠস্থানেই তাঁর অবস্থান, যেহেতু তাঁর কণ্ঠে প্রায়শই 'মা' 'মা' ডাক শোনা গেছে—সেই কারণেই ঐতিহাসিকগণ তাঁকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদদের সগোত্র করেছেন। যদিও অনেক ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 'নব্যহিন্দু আন্দোলন'[৩] বিশেষণ প্রয়োগের পক্ষপাতী।

বস্তুত হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানবাদীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণকে সংশ্লিষ্ট করা তাঁর চরিত্রের খণ্ডিত মূর্তির ওপর সিদ্ধান্ত টানা। রামকৃষ্ণ জীবনের বৃহত্তর ও মূল্যবান অংশ উপেক্ষিত হয়েছে— যা অবশিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত টানার প্রাক্কালে অতীব জরুরি। রামকৃষ্ণ চরিত্রের বিশ্লেষণী তথ্য সামনে বাখলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিতর্ক থাকবেই। সে প্রসঙ্গে আলোকপাতই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রেক্ষাপট

এই অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করব শ্রীরামকৃষ্ণের যুক্তি। স্বভাবতঃই হিন্দু-পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপট-আলোচনার অঙ্গীভূত হয়। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে সুনীতিরঞ্জন রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানবাদীরা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে পুনঃ প্রবর্তিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। অতীতের কোন্ যুগে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তা খুব স্পষ্ট হয়। মনে হয়, বৈদিক যুগ, মহাভারতের যুগ, অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের যুগই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে সংস্কারবাদী ও হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানবাদীদের পার্থক্যটিও স্মর্তব্য। সংস্কারবাদীরা বর্তমান সমাজব্যবস্থার কথাই চিন্তা করতেন, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতেন।

পুনরভ্যুত্থানবাদীরা গ্রীক্ দেবতা জেনাসের মতো অতীতের স্বর্ণযুগ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করতেন। সংস্কারবাদীদের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় সমাজ-চিন্তার অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবাদ, পুনরভ্যুত্থানবাদীদের আদর্শ ছিল হিন্দু শাস্ত্র এবং ভারতের অতীত ইতিহাস। লালা রাজপত রায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "The former are bent on relying more upon reason and the experience of European society while the latter are disposed to primarily look at the shastras and the past history and the traditions of their people and the ancient institutions of the land which were in vogue when nation was in the zenith of its glory."

ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মের প্রতি অনাস্থা ও অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন অনেকটা দানা বেঁধেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের নির্বিচার ধর্মান্তরকরণ ও হিন্দু-বিদ্বেষ। এর ফলে একশ্রেণীর হিন্দুর মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টাই হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের মূলে। শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭০-৭৯ কালপর্বকে 'ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা কাল' বলে উল্লেখ করেছেন।

'প্রচার' (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪), 'নবজীবন' (১৮৮৪) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ও হিন্দুধর্মের নব ব্যাখ্যাদান এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া এই একই সময়ে কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯০২) ও পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণির (১৮৫১-১৯২৮) হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ও নব্য হিন্দুধর্ম প্রচার 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান' আন্দোলনকে তীব্র গতিদান করেছিল।[৪]

উনিশ শতকের গবেষকগণের ধারণা এই শতকের শেষপর্বে যে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের জোয়ার এসেছিল তার অঙ্কুর শুরু হয়েছিল শতকের শুরুতেই বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক প্রতিস্পর্ধী প্রবণতার মধ্য দিয়ে। শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল খ্রিস্টধর্ম। রামমোহন রায় খ্রিস্টীয় 'ত্রিত্ববাদ' খণ্ডন করে খ্রিস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। আবার রামমোহনের পৌত্তলিকতা বিরোধী বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম ও ব্রহ্মসভার (১৮৩০) বিরোধিতা করে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ 'ধর্মসভা' (১৮৩০) প্রতিষ্ঠা করেছিল। রামমোহন খ্রিস্টধর্ম প্রবাহ রোধের উদ্যোগে যে ধর্ম ও ধর্মসভার সূচনা করেছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে তাই-ই হল 'ব্রাহ্মসমাজ'। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত রূপ মনে করতেন। মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ (১৮০৬-৭৮) প্রবর্তিত 'জেনারেল অ্যাসেমব্লি' এ দেশীয় কিশোর ও যুবকদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার কেন্দ্র হয়ে উঠলে তিনি এর প্রতিবাদে মুখর হন এবং তিনি রক্ষণশীল হিন্দু রাধাকান্তদেবকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। অতঃপর তৈরি হল 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'। অনুরূপ উদ্যোগেই 'হিন্দুকলেজে'র খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গের অপ্রতিহত গতায়াতের প্রতিবাদেই রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠী গড়ে তোলে

'হিন্দুমেট্রোপলিটন কলেজ'। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র খ্রিস্টভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটালে এবং 'ব্রাহ্মবিবাহ' প্রসঙ্গে 'ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়' মন্তব্য করলে প্রতিপক্ষ হিন্দুসমাজ হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনকে জোরদার করে।[৫]

তাই হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের কারণ হিসাবে দুটি শর্তের কথা উল্লেখ করেন গবেষকগণ। প্রথমটি মূলগত (basic) এবং দ্বিতীয়টি তাৎক্ষণিক (immediate)[৬]। মূলগত কারণটি হল হিন্দু সমাজ কর্তৃক প্রাচীন হিন্দু রীতিনীতিকে শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান করে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আর তাৎক্ষণিক কারণের নেপথ্যে আছে সমকালীন বিক্ষিপ্ত ঘটনার প্রবাহ; যথা—কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টপ্রীতি, 'ব্রাহ্মবিবাহ বিধি প্রবর্তন' (১৮৭২), 'ব্রাহ্ম স্ত্রী স্বাধীনতা', 'ইলবার্ট বিল' (১৮৮২) ও 'সহবাস সম্মতি বিধি' (১৮৯১)। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রায় বরাবরই ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিতা করেছে। তারা কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টপ্রীতি ভালোর চোখে দেখেনি; ব্রাহ্ম স্ত্রী স্বাধীনতা রক্ষণশীল হিন্দু চেতনার পরিপন্থী, ব্রাহ্মবিবাহ বিধি হিন্দু সমাজের বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার প্রতিবাদস্বরূপ, এবং পরিশেষ 'সহবাস সম্মতি বিধি'র মাধ্যমে হিন্দুকন্যার বিবাহের সময়কাল (অর্থাৎ দৈহিক পরিণতির পর বিবাহ ব্যবস্থার) নির্ধারিত হলে হিন্দুসমাজ প্রমাদ গণে। তারা বিদ্রোহী হয়েই পুনরভ্যুত্থানকে কামনা করে। এই আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দেয় 'ইলবার্ট বিল' সংক্রান্ত আন্দোলন। এই বিলে এ দেশীয় বিচারকদের দ্বারা ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপীয়গণ তা মানতে নারাজ হন। তাঁরা আন্দোলন চালালে সরকার ঐ উদ্যোগকে পরিবর্তন করেন। এই অবমাননা এ দেশে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করার যুক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা এবং সে চিন্তার পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা যথেষ্টই। অনেকে 'ভাবে' এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন—অনেকে 'জোর করে যুক্তি' খাড়া করে এই সিদ্ধান্ত অন্যকে মানাতে চান। এই অধ্যায়ে এহেন তিনটি তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। প্রথম তত্ত্বকে আমরা নামকরণ করা হচ্ছে 'প্রাতিষ্ঠানিক গুণাবলীভিত্তিক' বা Institutional' concept হিসাবে[৭], দ্বিতীয় তত্ত্বকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'আচরণিক ভিত্তি' বা Behavioural-concept হিসাবে[৮] এবং তৃতীয় তত্ত্বকে রাখা হচ্ছে 'উদ্ধৃতিভিত্তিক তত্ত্ব' বা 'Quotational concept' হিসাবে।[৯]

যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য গুণে রামকৃষ্ণকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদী বলে চিহ্নিত করতে চান তাঁদের বক্তব্য হল, 'কৈবর্ত রমণী রানী রাসমণি জাতিতে শূদ্র বংশীয়া। তিনি জাত্যকৌলীন্যে উন্নীত হতেই দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন

এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ গদাধরকে পুরোহিত থেকে অবতার পদে ঢক্কানিনাদের জোরে প্রতিষ্ঠা করেন।' যেহেতু হিন্দু আরাধ্যা দেবী কালীর কাছে পৌরোহিত্য জোরে তিনি অবতার হয়েছেন—সেই কারণে সমকালীন হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে তিনি সহজেই অংশীদার।[১৩]

আচরণীয় বৈশিষ্ট্যে যাঁরা রামকৃষ্ণকে ঐ পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষপাতী তাঁরা জানান, "হিন্দুধর্ম পুনরভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। কথায় ও কাজে হিন্দুধর্মকে নিম্নস্তর থেকে তুলে এনে তিনি উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের বড় বৈশিষ্ট্য যুক্তি বিরোধী ভক্তি চর্চা।.....রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুধু ভক্তি রসের প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত থাকেন নি, পাণ্ডিত্যকেও তিনি চরম আঘাত করেছিলেন। ভক্তিবাদভিত্তিক হিন্দু-জাগরণের দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা তিনি হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানীদের সঙ্গে শকুনদের তুলনা করে তিনি বলতেন, শকুনি যত উপরেই উড়ুক না কেন, তার নজর যেমন সব সময় ভাগাড়ের দিকে থাকে, তেমনি পণ্ডিতেরাও কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারে না। তিনি মনে করতেন, বেশি পড়াশুনার প্রয়োজন নেই—ভক্তি থাকলেই হল। গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা' 'গীতা' বলে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' বললে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, সে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে,...সেই গীতার মর্ম বুঝেছে।.....তিনি আরো বলেছেন, 'পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয়ে জানবার দরকার নাই। এই পাণ্ডিত্যবিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি শশধর তর্ক চূড়ামণি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কিছুটা কটাক্ষ করেছিলেন।"[১১]

এরপর উদ্ধৃতিমূলক তথ্য দিয়ে রামকৃষ্ণকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদী প্রমাণের নমুনা উপস্থাপন করা হবে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, "ঐ যুগের সর্বাপেক্ষা রহস্যবাদী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কেশবচন্দ্র সেন—এই দুই আধ্যাত্মিক পুরুষের যেমন একটা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেক্ষাপট ছিল, রামকৃষ্ণ ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। বাংলায় গ্রাম্যজীবন ও শিক্ষা-দীক্ষা-পূজা-অর্চনা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটেই রামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। অতি সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় তিনি তাঁর ভক্তগণকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র যেমন তাঁদের ব্রাহ্ম সমাজে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার একটা সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা ছিল সম্পূর্ণতই ভারতীয় ঐতিহ্যগত এবং পরিণামে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী। রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবাদমান আপাত-প্রতীয়মান বহুধা বিভক্ত সর্বথা-প্রতিযোগী, আচার সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীয় ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীয় ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত

ও দেশ-কালযোগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়— এবং কালবেশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।'...'নবযুগ ধর্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের বিচার এবং হে নবযুগ ধর্ম প্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম প্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।'[১২] অতঃপর তত্ত্ব প্রবক্তার মন্তব্য : "শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তব্যের আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। নিঃসন্দেহেই রামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে তিনি হিন্দু পুনরুভ্যুত্থানবাদী দৃষ্টিতেই দেখেছেন এবং সেই ভাবেই তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা প্লাবিত হয়েছে। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। রামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন ও উপদেশাবলী খুব সাধারণ, সরল এবং গ্রাম্য পদ্ধতিতে হিন্দু পুনরুভ্যুত্থানবাদের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।"[১৩]

হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের চেতনার মূল সুর

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন বিষয় বিচারে গবেষকগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের সগোত্র করতে চান। এ অধ্যায়ে আমরা হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নায়কদের চিন্তা-চেতনার মূল সুরকে উপস্থাপন করব যাতে পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা সহজতর হয়।

গবেষক সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী বহু তথ্য সমাবেশে হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নায়কদের কর্মপ্রয়াস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই আন্দোলনের বিশেষ নেতৃত্ব প্রসঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮), কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৮৯-১৯০২), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), অক্ষয় চন্দ্র সরকার (১৮৪০-১৯১৭), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ও যোগেশ চন্দ্র বসুর (১৮৫৪-১৯০৫) নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

গবেষণার বিস্তৃত বিশ্লেষণী ধারা থেকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের তিনটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা যায়। প্রথমত অহিন্দুদের প্রতি বিরূপ মনোভাব (শশধর তর্কচূড়ামণি খ্রিস্টান বিরোধী এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ব্রাহ্ম প্রতিরোধী); দ্বিতীয়ত প্রাচীন আচার ও কুসংস্কারকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণের প্রবণতা (কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণি কর্তৃক হিন্দু আচার সর্বস্বতার ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা) এবং তৃতীয়ত প্রগতিবাদী চিন্তা চেতনার বিরোধিতা (কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সহবাস সম্মতি আইনের বিরোধিতা, চন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক খাদ্যাখাদ্যের বিচার, জাতিভেদ ও বর্ণভেদের সমর্থন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নারী স্বাধীনতার ব্যঙ্গ করা; এবং যোগেশ চন্দ্র বসুর বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচারণ)।[১৪]

অহিন্দু অসহনীয়তা হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অথচ রামকৃষ্ণ ছিলেন ঐ চেতনার পরিপন্থী। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, একাধিক ধর্মের অনুশীলনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যও অব্যাহত ছিল। তিনি ইসলাম ধর্ম সাধনা করেছিলেন (১৮৬৭ সালে)। ওয়াজেদ আলি খাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর গাজিপীরের তলায় ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পাঠ করেছিলেন। প্রায়ই মোল্লাপাড়ার (দক্ষিণেশ্বর) মসজিদে নামাজ পাঠের সময় উপস্থিত থাকতেন। ফকির ওস্তাগরের কাছে দীর্ঘদিন ধরে কোরান পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে যেমন ডাঃ ওয়াজিজের মত শিক্ষিত মুসলমানও আসতেন, তেমনি একাধিক ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মুসলমানও (শেখ আবদুল শোভান, যোহন মোল্লা, খাতির মিস্ত্রি প্রমুখ) তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।[১৫] কেবল ইসলাম প্রতিনিধিই নয়, একাধিক শিখ প্রতিনিধির সঙ্গে রামকৃষ্ণের নিবিড় সংযোগ তাঁর জীবনীগ্রন্থে বিবৃত। সমকালে দক্ষিণেশ্বরে সরকারি বারুদগোলার পাহারায় শিখ সৈন্যদের যে পল্টন ছিল সেই শিখ ব্যক্তিদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রত্যহ সংযোগ ছিল; সেই সূত্র ধরেই ব্যারাকপুর ও দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের ব্যারাকের শিখ সৈন্যরা কাজের অবসরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। হাবিলদার কুঁয়োর সিং-এর সঙ্গে রামকৃষ্ণের যোগাযোগের বিস্তৃত সংবাদ সেখানে আছে। তাঁদের কাছেই রামকৃষ্ণ 'গ্রন্থ সাহেবের' পাঠ নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিনি শিখ ধর্মেও (১৮৬৪ সালে) দীক্ষা নিয়েছিলেন।[১৬] বৌদ্ধধর্মের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। খ্রিস্টানদের প্রতিও তাঁর স্বভাবজাত প্রীতি ছিল। সে ধর্মানুশীলনও তিনি করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পাদ্রী যোশেফ কুক তাঁর সন্দর্শনে এলে তিনি তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম জানান। তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এইচ. সি. টনিও রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এ সমস্ত ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের গভীর সম্প্রীতি ছিল। মুসলমানরা রামকৃষ্ণকে ভাবতেন তাঁদের 'পীর' বলে।[১৭] শিখরা সকলের সামনেই তাঁকে সম্বোধন করে বলতেন, 'তুমিই নানক'![১৮] সমকালীন ব্রাহ্ম সমাজের স্তম্ভ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী সকলের সঙ্গেই রামকৃষ্ণের ছিল আত্মিক সম্পর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নায়ক হতেন তাহলে অহিন্দু ব্যক্তিবর্গ কিভাবে তাঁর কাছে নৈকট্য ও নিরপত্তা পান ?

হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের দ্বিতীয় প্রকৃতি যা কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেও প্রতিবাদী। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে প্রথম পর্বে দেবীপূজায় লিপ্ত থেকেও ব্রাহ্মণের বর্ণচিহ্ন উপবীত বর্জন করেছিলেন। লোকাচার,

জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেননি ; মেথরকে আলিঙ্গন করেছেন। আচার-সর্বস্ব ভক্তকে বলেছেন, 'শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না '[১৯] হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীরা যখন আচারতন্ত্রকে জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেছেন, রামকৃষ্ণ তখন বলেছেন, শাস্ত্রজ্ঞান, আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, কৃচ্ছ্রসাধন, জপতপ কোনটাই অপরিহার্য নয়। মনই আসল— মানুষ মনেতেই মুক্ত— মনেতেই বদ্ধ।[২০] জনৈক ভক্তকে বলেছেন, 'কোশাকুশি ফেলে দাও'।[২১] শশধর তর্ক চূড়ামণি যখন সবকিছু কুসংস্কারের পিছনে 'বেদে আছে' বিশেষণ যোগ করেছেন—রামকৃষ্ণ তখন বলেছেন, 'কলিতে বেদ মত চলে না'[২২]।

যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিরোধ করেছেন রামকৃষ্ণ তেমনি প্রগতিবাদী চেতনারও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং সে চেতনায় তাঁর পার্ষদবর্গকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে ভক্তিরসের প্রাধান্য থাকলেও যুক্তিনিষ্ঠা কোন অংশে খামতি ছিল না। তিনি বলতেন 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন' ?[২৩] আরো বলেছেন, 'শুধু মেনে লওয়া কপটতা!'[২৪] তাঁর বিশেষ শিক্ষা নির্দেশ ছিল : 'ভদ্রতার নামে কাপুরুষ হবে না। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করলেও নপুংসক হবে না। কাম সম্পর্কে শুচিবাইগ্রস্ত হবে না।'[২৫] নারী স্বাধীনতার যে পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তা তাঁর জীবনী পাঠকমাত্রেই অবগত ! তিনি তাঁর স্ত্রী সারদাদেবীকে ভক্তদের ঘরে যাতায়াতের নির্দেশ দিয়েছিলেন : ভক্তা গৌরীদাসীকে মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৬] তিনি চাইতেন তাঁর পার্ষদরা ইংরাজীতে কথাবার্তা বলুক। সমকালীন বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ মহেন্দ্রলাল সরকারের 'বিজ্ঞান সভা' (Science Association) সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল।[২৭] বিশাল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তিনি তাঁর পার্ষদ হিসাবে যাঁদের চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। সর্বোপরি তাঁর আচার-আচরণে বিজ্ঞানমনস্কতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে প্রতি পদে পদে।[২৮] এরকম বহু নমুনাই উপস্থাপন করা যায় তাঁর প্রগতিবাদী চেতনার দ্যোতক।

অতঃপর রামকৃষ্ণের 'কালী সাধনা ও হিন্দু জাগরণ' সরলীকরণ প্রবণতা প্রসঙ্গে আসা যায়। রামকৃষ্ণ ধর্মীয় পুরুষ। ধর্মকে তিনি সামাজিক শর্ত হিসাবে দেখেছেন। একাধিক ধর্ম অনুশীলন করেছেন এবং সকল ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে একই— সেই প্রত্যয় দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছেন সকলকে। তথাপি বহুল প্রচারে তিনি কালীপূজক রূপে চিহ্নিত। এ ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। সকলেই জানেন,—'যত মত তত পথ' রামকৃষ্ণেরই সারস্বত বাণী। তথাপি তাঁকে একক ধর্মের নিগড়ে আটকে রাখার দূরভিসন্ধি কেন ? রামকৃষ্ণ কলকাতায় এসেছেন ১৮৫৩ সালে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেছেন ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত। দক্ষিণেশ্বর তথা কলকাতায় তাঁর ৩১ বৎসর কাল অবস্থানের মধ্যে মাত্র তিন বৎসর (১৮৫৬-৫৮ সাল) কালীপূজক পদে ব্রতী।[২৯] তারপর তাঁকে আর পূজকরূপে দেখা যায় নি। সেই জায়গায় পর্যায়ক্রমে হাজির হয়েছিলেন তাঁর ভাই রামতারক, তাঁর ভাইপো রামঅক্ষয় ও

রামলাল। এর পরবর্তী কালপর্বে তিনি বিভিন্ন ধর্মসাধনায় ও বিবিধ লোকশিক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এহেন কর্মবিন্যাসে যুক্ত রামকৃষ্ণকে কিভাবে কালীপূজক রূপে চিহ্নিত করা সঙ্গত ? আমাদের মতে এ যেমন সত্যের অপলাপ তেমনি ইতিহাস বিকৃতি! রামকৃষ্ণের অন্যতম সমালোচক বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণ কালীকিঙ্কর ছিলেন না। রামকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভ প্রস্তরময়ী কালীমূর্তি পূজা করে নয়। তা এসেছিল তাঁর আকুতি, সত্যনিষ্ঠা ও ধ্যান তন্ময়তায়।" রামকৃষ্ণ কণ্ঠে প্রায় উচ্চারিত 'মা' শব্দ কোন মূর্তির আঙ্গিক নয়, তা 'উন্নত চেতনার' প্রতীক। এ মন্তব্য রামকৃষ্ণ মিশনের একাধিক সন্ন্যাসীর।[৩০] রামকৃষ্ণ বলতেন ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যেই 'মা'— সেই-ই 'ব্রহ্ম'![৩১]

রামকৃষ্ণের 'ঈশ্বর' ও 'মা-কালী' প্রসঙ্গে বিশেষ বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক সন্ন্যাসী স্বামী সোমেশ্বরানন্দ: "এ বিশ্বে সবচেয়ে মহান সম্পদ মানুষের চেতনা। বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল শক্তিও এটিই। বিভিন্ন দেশ-কালে এই মানবচেতনা বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে নানান ক্রিয়াকাণ্ডে।....পূর্ণতা প্রাপ্তির আকুতিতেই মানবচেতনার শুরু। চেতনার পূর্ণবিকাশে এই পূর্ণতাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করেছেন।.....ধর্মের মাধ্যমে মানুষের যে মৌল আকুতি সুপ্রাচীন যুগে দেখা দিয়েছিল তার প্রকাশ ঘটেছিল পিতৃ-উপাসনা ও প্রকৃতি উপাসনার মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীযুগে কখনো পুরোহিত কখনও রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হলেন। ভারত-মিশর-গ্রীস-ব্যাবিলনের ইতিহাস আমাদেব এই তথ্যই দেয়। এর পরের যুগে ভারতীয় লোক-চেতনায় নতুন চিন্তা দেখা যায়। তখন মানুষ আর ঈশ্বর প্রতিনিধি নয়, ঈশ্বরের সমতুল্য হতে চাইছে।....আবার কখনো মানুষ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নিজেই ঈশ্বর হতে চাইল, ঈশ্বরের স্থানে বসার প্রয়াস করল। নীৎসের অতিমানব এই মতেরই প্রবক্তা। কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ে মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং, হো-চি-মিনও একই পথের পথিক। গত দুই শতকের ভারতে দেখা দিল নতুন চিন্তা। বহু মনীষী ও সমাজনেতা আবির্ভূত হয়ে জাতিকে পথ দেখাবার চেষ্টা করলেন। এঁদের অনেকে যেমন সরাসরি ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পাথেয় করে এগোতে চাইলেন, অনেকে আবার ঈশ্বরের স্থানে বসাতে চাইলেন অন্য কিছুকে। 'ঈশ্বরের স্থানে' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থানে, সার্ত্রের ভাষায় যা 'পরম' তার স্থানে। অক্ষয়কুমার দত্ত বসালেন বিজ্ঞানকে, ডিরোজিও যুক্তিকে, কবি ঈশ্বর গুপ্ত মাতৃভাষাকে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বজাতির ইতিহাসকে। পাশ্চাত্যেও দেখি একই ধারা। ঈশ্বরের স্থানে দস্তয়েভস্কি বসাতে চাইলেন ন্যায়কে, রুশো জনসাধারণের ইচ্ছাকে, হেগেল রাষ্ট্রকে, আর মার্কস সর্বহারা শ্রেণীকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের যে বিভিন্ন চিন্তাধারা দেখা গেছে তা এভাবেই মূলত ঈশ্বরকেন্দ্রিক। মানুষ কখনো ঈশ্বরের সমতুল্য হতে চেয়েছে, কখনো ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনো বা নিজেই ঈশ্বর হতে চেয়েছে, কখনো আবার

ন্যায়-রাষ্ট্র-শ্রেণী-ভাষা-স্বদেশ-বিজ্ঞান ইত্যাদির কোন একটিকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছে। মানুষ এটা করতে চাইছে কারণ এটাই তার মৌল প্রবৃত্তি যাকে আমরা মানবচেতনা বলে আগে উল্লেখ করেছি, সার্ত্রে যাকে বলেছেন 'পরম'।

....শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা পদ্ধতির মধ্যেও এই সত্যের প্রমাণ পাই। সাধক অবস্থায় কালী প্রতিমার পায়ে ফুল দিতে গিয়ে বারবার ফুল দিয়েছেন নিজের মাথায়। সমস্ত সাধনার শেষে ষোড়শী পুজোয় সাধনার ফল আর জপের মালা অর্পণ করলেন মানুষেরই পায়ে। আবার পৃথিবীর মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার আগে কাশীপুরের শেষ শয্যায় যে ফটোতে তিনি শেষবারের মত ফুল দিলেন সেই ফটোটিও ছিল মানুষের। এই তিনটি ঘটনা তাৎপর্যময়। দেবতার ফুল বারবার গিয়ে পড়েছে মানুষের কাছে। সাধক অবস্থায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—'মা, আরেকটা দিন চলে গেল, দেখা দিলি না!' সাধনার শেষে তিনিই কেঁদেছেন মানুষেব জন্য: 'ওরে, তোরা কে কোথায আছিস, আয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন।"[৩২]

উপসংহার

এই আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ক্রিয়া পারম্পর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঊনিশ শতকের ইতিহাসে ধর্ম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব রামকৃষ্ণকে বিশ্লেষণের জন্য স্বতন্ত্র শিরোনামের আবশ্যক। বস্তুতঃ ঊনিশ শতকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দুটি ধারার পরিবর্তে তিনটি ধারা লক্ষিত হয়। একটি ধারা পাশ্চাত্য অনুসারী (মুখ্যতঃ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী), দ্বিতীয় ধারাটি প্রাচ্য অনুসারী (মুখ্যতঃ হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীরা) এবং তৃতীয় ধারাটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনকামী অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রক্রিয়াটি যেমন আধুনিক তেমনি ভারতীয়! সেই কারণে রামকৃষ্ণকে তৃতীয় ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করাই বিধেয়। রামকৃষ্ণ চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে স্বীকার করেন। ঊনিশ শতকের ইতিহাসে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের প্রগতিবাদী চেতনাসমূহ 'নব্য হিন্দু আন্দোলন' শিরোনামে উপস্থিত হওয়ার নেপথ্য কারণ রামকৃষ্ণই। রামকৃষ্ণের ধর্ম ও আধুনিকতার যৌথচর্চার জন্য গবেষকগণকে ঐ জাতীয় শিরোনাম ব্যবহার করতে হয়েছে।

ঊনিশ শতকের ধর্ম সংস্কৃতির আন্দোলনকে দ্বিমুখী ধারায় ব্যাখ্যায অনেক ঐতিহাসিকই দ্বিধাগ্রস্ত। প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের মন্তব্য উপস্থাপন করলে আমাদের সিদ্ধান্তে আসা সহজতর হবে।

"বাংলার জাগরণের প্রথম পর্বটি পাশ্চাত্যকরণের যুগ এবং দ্বিতীয় পর্বটি প্রাচ্যকরণের যুগ—এভাবে দেখা উচিত নয়। প্রথম পর্বে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফলগুলিকে আয়ত্ত করার—আধুনিকতাকে গ্রহণ করার সুতীব্র

আগ্রহ। প্রথম পর্বে কেউ কেউ (বিশেষ করে ইয়ং বেঙ্গল) ইংরেজিয়ানা ও আধুনিকতা—এই দুটিকে সম-অর্থবাচক বলে মনে করতেন। তবে সেই পর্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা—যেমন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকতা—এই দুইয়ের পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ সজাগ ছিলেন এবং তাঁরা দেশকে পাশ্চাত্যকরণের দিকে নয়, আধুনিকতার দিকে নিয়ে যেতে বিশেষ সচেষ্ট হন।

আবার যাঁরা মনে করেন—ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সৃজনশীলতার মূল উপাদানগুলি লুক্কায়িত ছিল এবং বাইরে থেকে আনা এক-আধটু সংশোধনই যথেষ্ট ছিল, তাঁরা ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনটি জীবনের স্রোতধারাকে যে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দিয়েছিল—এটি বিস্মৃত হন। তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যুগধর্মের গুরুত্বটি খুবই ছোট করে দেখেন। মনে রাখতে হবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ দেশের ঐতিহ্য সন্ধানে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন, কিন্তু আধুনিকতাকে বাদ দিয়ে নয়।

আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সম্পর্কটি কি—এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। কি রামমোহন, কি ইয়ং বেঙ্গল, কি বিদ্যাসাগর, কি বঙ্কিমচন্দ্র, কি বিবেকানন্দ, কি রবীন্দ্রনাথ—সকলের কাছেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে—আধুনিকীকরণের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া দেশবাসীর পক্ষে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হওয়া ও দেশের জাগরণের পথ প্রশস্ত করার আর কোন উপায় নেই। আবার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করতে না পারলে, এই প্রক্রিয়াটি দেশবাসীর চেতনার প্রবেশ করবে না এবং এটি বন্ধ্যা হয়ে রইবে। রামমোহন ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে চাইলেন। এমনকি ইয়ং বেঙ্গল—যাঁদের চোখে পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণ—এই দুটি প্রক্রিয়া প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল—তাঁরা বলতে বাধ্য হলেন যে ইউরোপীয় চিন্তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তবে তাকে প্রকাশ করতে হবে ভারতীয় ভঙ্গীতে। বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর আধুনিকতা, যদিও জাতীয় ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ দিকটির প্রতি দৃঢ়মূল থেকেই তিনি যুগধর্মকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী হলেও সাধারণভাবে আধুনিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেননি। এঁদের চিন্তায় সমকালীন ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার চূড়ান্ত প্রভাব লক্ষ্য করার বিষয়।

আধুনিকীকরণ ও ঐতিহ্য সন্ধান পরস্পর সংযুক্ত। আধুনিকীকরণ যদি দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য হয় তাহলে তা নকলনবীশীর নামান্তর হয়ে উঠতে বাধ্য। কাজেই ঐতিহ্য যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—এঁরা সকলেই নিজের মত করে এই যাচাই করার কাজে হাত দেন। অবশ্য, কার চেষ্টা কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে কালের বিচারে তার চূড়ান্ত হিসাব মিলবে। যুগধর্মের আলোকে ঐতিহ্য সন্ধানের কাজে লেনিনের যে লেখাগুলি মার্কসবাদীদের কাছে দিক্ নির্দেশক হতে পারে তা হলো The Heritage of

Renounce, In Memory of Herzen, Tolstoy, The Mirror of Revolution, The National Pride of the Great Russians প্রভৃতি।’[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মীয় পরিভাষায় কথা বললেও, ভারতীয় ঐতিহ্যেব সারস্বত বাণীকেই প্রচার ও প্রসার ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনার স্বাতন্ত্র্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ধর্মকে তিনি সোস্যাল কমিটমেন্টের সামিল করতে চেয়েছিলেন। তার ভ্রান্তি দূর করে তাকে সামাজিকীকরণের বিশেষ শর্ত হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। ধর্মের ফোরামে দাঁড়িয়েই ধর্মতন্ত্রকে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিলেন। তাই তাঁর শিক্ষাকে জনগণ সহৃদয়তা দিয়ে গ্রহণ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় সার্বভৌমিকতার কথা স্বামী বিবেকানন্দ সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিনিয়তই ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ যা শিখিয়ে গেছেন তা-ই হচ্ছে ঠিক ঠিক ধর্ম। তাকে হিন্দুরা হিন্দুধর্ম বলে। অন্যেবা তাদেব রুচিমত নাম দেয়।”[১৪]

শ্রীবামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা যে মৌলবাদী ধর্ম চেতনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মার্কসবাদী ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতেও তা উজ্জ্বল : “যে ধর্মসংস্কারে রামকৃষ্ণ পরমহংসে ব্রতী হন সেখানে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, সবাই সমান ; সবাই মায়ের সন্তান। তখনকার সমাজের হাওয়ার সঙ্গে এই ধর্মীয় সাম্যবাদ সহজেই সঙ্গতি খুঁজে পেল। জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত মানুষকে এক মায়ের আহ্বানে সামিল করে, রামকৃষ্ণ তখনকাব সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি কবতে পেবেছিলেন। এই ঐক্যবোধ সেদিনকার জাতীয় আন্দোলনের ছিল, এক পরম সম্পদ।”[১৫]

এহেন রামকৃষ্ণকে হিন্দু পুনবভ্যুত্থানবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত অন্যায়। আমরা বলব শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন অন্ধ পাশ্চাত্য অনুসারী নন—তেমনি অন্ধপ্রাচ্য অনুগামীও নন ; তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বী— আধুনিক ও ভারতীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রেব এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটি যেন আমবা কখনো না বিস্মৃত হই।

তথ্যসূত্র

১. ‘ভাবতেব মুক্তি সংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব’, অমলেশ ত্রিপাঠী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৭, পৃঃ ৩১-৩২

২. *Bengal Renaissance and other Essays*, Sushovan Sarker, New Delhi, p. 3 foot note.

‘বাংলা প্রগতি সাহিত্যেব আত্মসমালোচনা’, ‘মার্কসবাদী’, ববীন্দ্র গুপ্ত, ৫ম সংকলন, সেপ্টেম্বব, ১৯৪৯।

৩. ঊনিশ শতকেব নব্য হিন্দু আন্দোলনেব কযেকজন নাযক, সুনীতিবঞ্জন বাযচৌধুবী, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১-১৯

৪. তদেব, পৃঃ ৫-৬

৫. তদেব

শ্রীরামকৃষ্ণের কৈশোরকাল ও সমকালীন কামারপুকুর

ṛঞ্চের আবির্ভাব ঘটেছিল উনিশ শতকে কামারপুকুর গ্রামে। রাঢ়বঙ্গের এই অঞ্চলের সঙ্গে বঙ্গ ইতিহাসের নিবিড় সংযোগ। এরই পাশ দিয়ে বিরাজ করছে মধ্যযুগের পাদশাহী সড়ক—হোসেন শাহের কীর্তির সাক্ষব—এরই নিকটে অবস্থিত প্রাচীন বঙ্গবাজ শূববংশীয় লক্ষ্মীশূরের রাজধানী অপারমান্দার যেখানে পরবর্তীকালে ইসমাইল গাজী নির্মাণ করেছিলেন গড় মান্দারণ। রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে বিরাজমান এই ভূখণ্ডেই যুগান্তর পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই তাঁর জীবনধারা কেবল এক ব্যক্তির পরিচয়ই নয় সমকালীন যুগের প্রেক্ষাপট ও গণজীবনের ঐতিহাসিক দলিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের শৈশবকালীন ঘটনার বিক্ষিপ্ত বিবরণ থাকলেও ঘটনাপারম্পর্যে তার বিশ্লেষণ অনুপস্থিত, পাত্র-পাত্রীর সম্যক পরিচয়ও সেখানে গরহাজির। এই নিবন্ধে সেই সমস্ত বিস্মৃত ব্যক্তিদেব উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে সমকালীন গণজীবন দর্শনেরও যেমন অবকাশ আছে তেমনি বালক গদাধরের বৈপ্লবিক মানসিকতা উপলব্ধিও বিস্ময়কর সুযোগ পাওয়া যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৬ সাল) তখন এদেশে ইংরাজ শাসন কায়েম হয়েছে প্রায় ৭৯ বছর আগে। ইংরাজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎকৃষ্ট ফসল হল জমিদারতন্ত্র—উনিশ শতকে যা কলঙ্কিত অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। শ্রীরামকৃষ্ণজীবন সেই কুখ্যাত ইতিহাসের উজ্জ্বল সাক্ষী। সমকালীন পত্রিকা তত্ত্ববোধিনীর পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত আছে জমিদার জুলুমের কথা, জোর করে জমি দখল নেওয়া ও মিথ্যা মামলায় ব্যক্তিকে বাস্তুচ্যুত করা। অকারণে ব্যক্তির ওপর জুলুম ও অত্যাচার ছিল সেযুগের সমাজব্যবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণের আদি বাসভূমি দেরে গ্রাম ছেড়ে কামারপুকুরে বসবাস সমকালীন জমিদারতন্ত্রের শোষণ-পীড়নের অশ্রুমথিত ইতিহাস।

জীউ ও শিবের পূজা খুব আড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হতো। কামারপুকুরের ধর্মঠাকুরের নাম রাজরাজেশ্বর ধর্ম। এই মূর্তি কচ্ছপকার। গাজন ছাড়া এই দেবতার উদ্দেশ্যে আগে নানা যাত্রা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে লক্ষ্য করা যায় যে পাঁজা ও বাড়ুই পরিবার এই দেবতার সেবাইত। ধর্মঠাকুরের পূজা হিন্দুধর্ম-বহির্ভূত পূজা; এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের শেষ স্মৃতি এই ধর্মঠাকুর। গ্রামের মনসাদেবীর

পূজাও এক প্রাচীন ঐতিহ্যের ইঙ্গিত। দশহারা, সংক্রান্তি প্রভৃতি বিশেষ তিথিতে ঐ সমস্ত দেবতার পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। বাগ্দী, ডোম, কৈবর্ত, যুগী প্রভৃতি জাতির কুলদেবতা হলেন মা-মনসা, সুতরাং মনসাপূজা তাদের কাছে প্রধান পূজা বলে গণ্য। গ্রামে ঐ সমস্ত জাতির ব্যক্তির সংখ্যা অধিক বলেই মনসাদেবীর পূজা তাদের কাছে বৃহৎ উৎসব হিসাবে চিহ্নিত ছিল। সুবর্ণবণিক পরিবারে হরিবাসর ও হরিসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীকার শশিভূষণ ঘোষ মহাশয়। গ্রামে দামুদর জীউর একাধিক মন্দিরের উপস্থিতি গ্রামে বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারাকে স্বীকৃতি দেন। ৺বুড়ো শিবঠাকুর ও ৺গোপেশ্বর শিবঠাকুরের পূজাদি গ্রামে শাক্ত চেতনার পরিচায়ক। কার্যত কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকালে চাষনির্ভর গ্রামবাসীদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভক্তির মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক ধর্মানুষ্ঠান সমমাত্রায় পরিচালিত ও চর্চিত হতো।

কামারপুকুর কৃষকপ্রধান গ্রাম হলেও ঐ গ্রামে রাঢ়ীয় সংস্কৃতির ধারা বহতা ছিল। বৈষ্ণবপ্রধান স্থান, সন্ধ্যা সমাগমে কারো কারো ঘরে ভাগবতপাঠ, পুরাণপাঠ বা সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হতো। সমকালে ঐ গ্রামে যাত্রার তিনটি দল, বাউলের একটি দল ও কবিগানের দুটি দল ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে গ্রামের সীমানা দিয়ে প্রসারিত পাদশাহী সড়কের ওপরই অবস্থিত ছিল লাহাবাবুদের অতিথিশালা, যেখানে নিত্য বহুসংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাগমে কামারপুকুর চটির অতিথি নিবাস মুখরিত থাকত। তাঁদের প্রাত্যহিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত গীতা, সংহিতা, উপনিষদ, চণ্ডী প্রভৃতির আবৃত্তি ও ব্যাখ্যার আসর সমকালীন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বিষয়। কারণ সেই সংস্কৃতির ধারায় পরিপুষ্ট হয়েছেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। রাঢ় সংস্কৃতির এই বিশেষ ধারা শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে খুব সামান্যই উল্লেখ আছে, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ মানস বিশ্লেষণে তার বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণ অতীব জরুরি। এ নিবন্ধ সে চালচিত্র উপস্থাপনের অভীপ্সা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, প্রথানুগ সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীর সমর্থক ছিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তারই প্রতিবাদকল্পে পাঠশালার শিক্ষাকে 'চালকলাবাঁধা' বলে যেমন বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তেমনই তা বর্জন করেছেন হেলায়। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গেই জানিয়েছেন, পাঠশালায় শুভঙ্করী ধাঁ ধাঁ লাগত। এই ঘটনার সূত্র ধরে সমকালীন গ্রাম্য পাঠশালার এক ঐতিহাসিক দলিল চিত্রিত করা যায়। বালক গদাধরের পাঠশালার শিক্ষা নিয়ে শশিভূষণ ঘোষ বিবৃত বিবরণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "পাঠশালায় শিক্ষা এদেশের জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দালানে বা চণ্ডীমণ্ডপে ইহার অধিবেশন হইত। গুরুমহাশয়ের বৃত্তি ব্রাহ্মণরা প্রায় গ্রহণ করিতেন না, অধিকাংশ স্থানে কায়স্থ বর্ণের হস্তে ইহা থাকিত। পাঠশালায় বালকের শিক্ষা সাধারণত পাঁচ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া চারি পাঁচ বৎসর পরে শেষ হইত। বালক হাতেখড়ির পর, তালপাতায় বর্ণমালা

ও বানান বলিতে আরম্ভ করিত, আর সকল বালকে মিলিয়া সমস্বরে মানসাঙ্ক, কড়া গণ্ডা দশক নামতা বলিতে বলিতে এই সকল তাহার মুখস্থ হইয়া যাইত। পরে তালপাতায় এই সকল অঙ্ক লিখন অভ্যাস করিয়া কলপাতায় তেরিজ, জমাখরচ প্রভৃতি ও নামধাম পত্র লিখিবার ধারা এবং সর্বশেষে কাগজে, হাতে লেখা পুঁথি দেখিয়া প্রতিলিপি লিখন ও পুঁথিপাঠ শিক্ষার পর পাঠশালার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। দুই-চারিজন কায়স্থাদি উচ্চবর্ণ ব্যতীত শুভঙ্করী নিয়ম মাসমাহিনা সুদকষা জমাবন্দী খৎ লেখা মহাজন ও জমিদারের খতিয়ান খাতা লিখন প্রভৃতি অপর কেহই শিক্ষা করিত না। অর্থোপার্জন এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না, কোনরূপ বিদ্যার্জনও ইহার বিষয় ছিল না। পাঠশালায় পড়িলে বিশেষ গৌরব হইত না, আর এরূপ শিক্ষার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সমাজের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করিত না। এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে কি গৃহস্থ কি কৃষক কি দোকানী ও কি মহাজন সকলেই আপনার দৈনিক কার্য অনায়াসে নির্বাহ করিতে পারে; যাহাতে সকলেই নিজের কেনা-বেচা ও দেনা-পাওনার হিসাব, আত্মীয় স্বজনের সংবাদের জন্য পত্র লেখা, আর অবসর থাকিলে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ভাষা-পুঁথি পাঠ করিয়া শাস্ত্রের মর্মগ্রহণ ও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে।"

এহেন পাঠশালা-শিক্ষাসূচীতেই গদাধরকে রত করতে চেয়েছিলেন তাঁর অভিভাবকগণ। অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও সে শিক্ষাসূচী তিনি সমাপ্ত করেছিলেন। পাঠশালা পাঠ্যসূচীর প্রহ্লাদ চরিত্র ও দাতাকর্ণ পুঁথি দুটি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়েছিল। সেগুলি পুনরায় তিনি পাঠ করে শোনাতেন কামারপুকুর গ্রামের অন্যান্য হীনবর্ণের ব্যক্তিদের। গ্রামের যেখানে পুরাণপাঠ, ভাগবতপাঠ, চণ্ডীপাঠ, কবিগান, যাত্রাগান, বাউলগান পরিবেশিত হত, বালক গদাধর সেখানেই অবলীলায় হাজির থেকে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনতেন এবং তা স্মরণ রাখতে সচেষ্ট হতেন। সেই লোকসংস্কৃতির উপাদান থেকেই বালক গদাধর সংগ্রহ করেছিলেন পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ চেতনার অভিজ্ঞান।

সমকালীন লোকসংস্কৃতির এই বাতাবরণে আবর্তিত হয়ে বালক গদাধরের যে সঞ্চারপথ সংগঠিত হয়েছিল এই গ্রামে তার সুচারু উপস্থাপনায় বালকের এক বিস্ময়কর সমাজমানস উপলব্ধি করা যাবে এবং সেই সত্যের উপযুক্ত অভিজ্ঞানেই শ্রীরামকৃষ্ণমানস অনুধাবন সহজতর, নতুবা যুক্তিহীন ভ্রান্তভক্তির চোরাবালিতে অপরাজেয় পুরুষকার শ্রীরামকৃষ্ণ হারিয়ে যাবেন পদে পদে।

সমকালীন কামারপুকুরে নিম্নবর্ণের বাসিন্দারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পদবীতে তাঁরা হলেন মুচি, বাড়ুই, জেলে, বাগদী, হাড়ি, মোদক, ডোম, গুঁই, ছুতার, যুগী, দুলে, মাল, কর্মকার, পোড়েল, লায়েক, ধাড়া, পাইন, লাহা, সেখ প্রভৃতি। এহেন সমাজপরিবেশে কামারপুকুরে মাত্র দু-এক ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। সে পরিবেশে ব্রাহ্মণ ব্যক্তিরা নিম্নবর্ণের ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে দূরে রাখতেন নিজেদের। ঐ সমস্ত নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের কাছে ছিলেন অচ্ছুৎ। একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল

পাঠশালার পঠন-পাঠনেও। গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুচি, বাগ্দী, জেলে, বাড়ুই, যুগীর সন্তানরা অবশ্যই সে পাঠশালায় প্রবেশাধিকার পায়নি। সমাজ-সচেতন বালক গদাধরের প্রতিবাদী কণ্ঠ সেদিন সোচ্চার হতে পারেনি কিন্তু কেঁদে উঠেছিল তাঁর হৃদয়। বুদ্ধির অধিকারী হয়েও হেলায় পাঠশালা ছেড়ে সেই সবার পিছে সবার নিচে—সর্বহারাদের মাঝে আশ্রয় করে নিয়েছিল সেই বালক। তাঁর জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ নেই যে, তিনি ধনীগৃহের আনন্দানুষ্ঠানে আসীন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরিশীলিত শিক্ষাচর্চায় মশগুল, ধনীর দুলালের সঙ্গ-পিয়াসী। বালক গদাধরকে লক্ষ্য করা যেত গ্রামের হীনবর্ণের (মুচি, বাগ্দী, দুলে, পোড়েল, গুঁই প্রমুখ) ব্যক্তিদের গৃহে যেখানে তাদের তিনি পুরাণ, ভাগবত আবৃত্তি করে শোনাতেন; সঙ্গীত লহরীতে আপ্লুত রাখতেন। বালককে লক্ষ্য করা যেত মাঠের রাখালদের মাঝে যখন তারা মাঠে গবাদি পশুদের বিচরণে ছেড়ে দিয়ে নিকটের বনে ক্রীড়ামত্ত থাকত। সেখানেও বালক গদাধর নিপুণ ক্রীড়াশীল। তাদের অভাব, অশিক্ষা, অপরিশীলিত জীবনচর্চা তাঁর স্বচক্ষে দেখা। তাই তাদের সেখান থেকে তুলে আনার ব্যাকুলতায় বালক হয়েছিল ভীষণ ব্যগ্র। বালক প্রথমে তাদের সঙ্গী পরে তাদের সঙ্গীতশিল্পী—আরো পরে তাদের অভিনয়-শিক্ষক। কেবল শিক্ষকের ভূমিকাতেই নয়, তিনি তাদের নট-নাট্যকার ও নটীও। এহেন সঙ্গীকে উপেক্ষা করার সাধ্য কার?

গদাধরজীবনে এই বান্ধবগোষ্ঠীকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ রাখাল বন্ধুগোষ্ঠী, দ্বিতীয়তঃ প্রতিবেশী বন্ধুগোষ্ঠী এবং তৃতীয়তঃ মহিলা বন্ধুগোষ্ঠী। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে এই কৈশোরকাল ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী তাঁর চরিত্রের এক অভিনব আঙ্গিক। বালক গদাধরের রাখাল সংসর্গে স্মৃতি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত পরিবাহিত হয়েছে। এ হয়তো তাঁর স্বেচ্ছাকৃত স্মৃতিচারণ। রাখালদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের বাড়ি যাতায়াত করা, তাদের নিজগৃহে আনা ও আপ্যায়ন করা সে সমাজে যেমন অস্বাভাবিক তেমনই আপত্তিকর ছিল। হয়তো তাঁর অগ্রজরাও তাঁর এ অভিব্যক্তিকে অনুমোদন করতেন না। যেহেতু পিতৃহারা কনিষ্ঠ সেই কারণে কষ্টকর হলেও অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা অনুজের এ আবদার মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর এই ভাবের জন্য (অসম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য) তাঁর বাড়ির ব্যক্তিরা খুব বিব্রত বোধ করতেন; সেই শঙ্কায় তিনি বেশিদিন দেশে থাকতে পারতেন না; চলে আসতেন তাড়াতাড়ি দক্ষিণেশ্বরে।

বিভিন্ন সূত্রবলে তাঁর কিছু রাখাল বন্ধুর নাম উদ্ধার সম্ভব হয়েছে; কেদারমাল, বসনমাল, শিবু লায়েক, নটবর পোড়েল, কৃষ্ণ পোড়েল, যোগেন্দ্র পোড়েল প্রমুখ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মধুযুগী, গঙ্গাবিষ্ণু লাহা, কুঞ্জবিহারী কর্মকার প্রমুখও তাঁর বন্ধু বলেই কথিত। মাল ও লায়েকদের বাড়িতে আগে গো-প্রতিপালন হত যথেষ্ট। দুধের ব্যবসা করত তারা, ঐ সমস্ত বালক গোচারণে যেত নিত্যই। কার্তিক বাড়ুই, নদেরচাঁদ জেলে, দীননাথ দুলে প্রমুখের সঙ্গে গদাধরের সংযোগসূত্র উজ্জ্বল।

কামারপুকুরে বাড়ুইপাড়ায় যেখানে ধর্মঠাকুরের অবস্থান এবং জেলেপাড়ায় যেখানে মনসার বিগ্রহ স্থাপিত সেখানেই শয়লার মেলা বসত প্রতি বছর। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেখানে যাত্রাগানের আসর বসত—চলত কবির লড়াই। গদাধর তার বড় শ্রোতা— নিপুণ সমঝদার, নিখুঁত সংগ্রহকার। বাসনা দেবী বলেন, "কার্তিক বাড়ুই, দীনু জেলে, কৃষ্ণ পোড়েলকে বৃদ্ধ অবস্থায় দেখেছেন; তাঁরা মাকে (শ্রীশ্রীমাকে) খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। মা-বলতেন, ওদের নিয়েই ঠাকুর যে যাত্রার দল গড়েছিলেন ছোটবেলায়; তিনি চারটে পালাগান গড়েছিলেন ওদের নিয়ে। কামারপুকুরের মনসাতলায়, শিবতলায় ওরা অনেকবার সে যাত্রাপালা করেছে।"

বাড়ির নিকটবর্তী কিশোরদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারা প্রধানতঃ তাঁর পাঠশালার বন্ধু। তাদের অনেকেরই নাম প্রামাণিক গ্রন্থে উদ্ধৃত। গঙ্গাবিষ্ণু লাহা, কুঞ্জবিহারী কর্মকার, গণেশ ঘোষাল (শ্রীপুর), শ্রীরাম মল্লিক (শ্রীপুর), রামদাস লাহা প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধু তালিকার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বালক গদাধর শিবচতুর্দশীতে 'দক্ষযজ্ঞ' পালার শিবের ভূমিকায় অভিনয়কালে তাঁর স্যাঙাৎ গঙ্গাবিষ্ণু তাঁকে শিবের সজ্জায় সজ্জিত করেছিলেন। অপর বন্ধু রাম মল্লিকের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "শ্রীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল—রাতদিন একসঙ্গে থাকতাম, একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম—তখন ষোল সতের বছর বয়স। লোকে বলত, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হলে দুজনের বিয়ে হত। তাদের বাড়িতে দুজনে খেলা করতাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বান্ধবমণ্ডলের আর এক গোষ্ঠী হল কিশোর গদাধরের বালিকা বন্ধুমণ্ডলী। ধর্মদাস লাহার প্রথমা কন্যা প্রসন্নময়ী গদাধরের চেয়ে বয়স্কা এবং তাঁদের পরিবারের শুভানুধ্যায়িনী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ধনী কামারনীর উপনয়ন কথার অবতারণা এ প্রসঙ্গে খুবই জরুরি। শ্রীরামকৃষ্ণ উপনয়নকালে প্রথম ভিক্ষা নিয়েছিলেন ধনী কামারনীর হাতে। ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও বস্তুতঃ ঘটনাটি ছিল ঘনঘটায় পরিপূর্ণ—রীতিমত সমস্যাসঙ্কুল। ব্রাহ্মণসমাজ রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের প্রশমনে রামকুমার (শ্রীরামকৃষ্ণ-অগ্রজ) গদাধরকে পুনঃপুনঃ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শূদ্রের নিকট ভিক্ষাগ্রহণ অশাস্ত্রীয় ও কুলপ্রথাবিরোধী। কিন্তু গদাধরকে নিবৃত্ত করা যায়নি। প্রথাবিরুদ্ধ কাজের জন্য কামারপুকুর সংলগ্ন শ্রীপুর গ্রামের মুখোপাধ্যায়, ঘটক ও ঘোষাল পরিবার গদাধর প্রসঙ্গে অনুনাসিকই ছিল। আমাদের বিশ্বাস ধনী কামারনীর ভিক্ষাগ্রহণ—তাঁর সমাজের হীনবর্ণের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা; এমন কি তিনি তাদের সঙ্গে সখ্য সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন গভীরভাবে। এই ধনী কামারনীর ভগ্নী শঙ্করীও তাঁর বিশেষ ভক্তা ছিলেন। পাইন-বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির সম্পর্কের কথা পুঁথিকার জানিয়েছেন। সীতানাথ পাইনের কন্যা রুক্মিণীদেবী স্বামী সারদানন্দজীকে জানিয়েছিলেন গদাধর প্রসঙ্গে তাঁদের বিশেষ অভিব্যক্তি : "আমাদের

বাড়ি তখন লক্ষ্মীমন্তের বাড়ি বলেই মনে হত। খুড়তুতো, জাঠতুতো বোন মিলে আমরা সতের-আঠারোটি ছিলুম; বয়সে দু-পাঁচ বছরের ছোট-বড় হলেও সবাই যৌবনে পড়েছিলুম। গদাধর শিশুকাল থেকেই আমাদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেন, সেজন্য আমাদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পড়লেও তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন; তিনি নিজে বড় হবার পরও আমাদের বাড়ির অন্দরে যাতায়াত করতেন। বাবা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। পাড়ার কেউ কেউ বাবাকে বলত, তোমার বাড়িতে এতগুলি যুবতী মেয়ে রয়েছে, গদাধর এখন বড় হয়েছে, তাকে এখনও অত বাড়ির ভিতরে যেতে দাও কেন? বাবা বলতেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব চিনি। তারা সাহস করে আর কিছু বলতে পারত না। বাড়ির অন্দরে এসে গদাধর আমাদিগকে কত পুরাণকথা শোনাতেন, কত রঙ্গরস করতেন। যেদিন না আসতেন—আমাদের মন খুব ছটফট করত। চিন্তা করতাম, তাঁর শরীর খারাপ হয়নি তো! তখন আমাদের একজন জল আনার অজুহাতে বামুনমার (চন্দ্রামণিদেবী) কাছে তাঁর সংবাদ নিয়ে এলে তবে আশ্বস্ত হতুম।" রুক্মিনী দেবী ছাড়া পাইনবাড়ির কন্যা বিভা দেবী, জ্যোতিরাণী, মহামায়াদেবী প্রমুখ এবং লাহাবাড়ির কন্যা গৌরীবালা, শিশুবালা প্রমুখেব নাম উল্লেখ করেন বাসনাদেবী। তিনি জানান যে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের বৃদ্ধা অবস্থায় তিনি দেখেছেন এবং মা জানিয়েছিলেন যে ঐ সমস্ত বৃদ্ধারা ঠাকুবের সমবয়সী ও ঠাকুরের বাল্যকালে তাঁরা খেলার সাথী ছিলেন।

এই পাইনবাড়ির সঙ্গে গদাধরের আর একটি বিশেষ ঘটনা তাঁর জীবনীগ্রন্থে বিবৃত। দুর্গাদাস পাইন গ্রামের ধনী ব্যক্তি বলেই কথিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সীতানাথ পাইনের খুড়তুতো ভাই। দুর্গাদাস পাইনের ঘরে কঠোর অবরোধপ্রথা বলবৎ ছিল। তিনি তাঁর ঘরের মহিলাদের কখনো বাইরে বের হতে দেননি। তাঁর দাবি ছিল যে, তাঁর ঘরের মহিলাদের মুখ গ্রামের কোন পুরুষমানুষ দেখতে পায়নি। এর জন্য তিনি নিজেকে অভিজাত বলে মনে করতেন এবং দম্ভও প্রকাশ করতেন। তাঁর এ অহঙ্কার গ্রামের অন্য কারো মনে কোন রেখাপাত না করলেও বালক গদাধরকে বিশেষ ব্যথিত করেছিল। মহিলাদের এই পর্দানসিন প্রথা তিনি যে সমর্থন করেননি—সমকালীন ঘটনাই তার প্রমাণ। তিনি সুঅভিনেতা ছিলেন এবং নটীচরিত্রে তাঁর অভিনয়দক্ষতা সমকালীন ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। কালীয়দমন পালায় তিনি রাধাচরিত্রে এবং সীতার বনবাস পালায় সীতার অভিনয়ে খুবই প্রশংসা পেয়েছিলেন। কাজেই মহিলা পোশাক পরে নিখুঁত মহিলার অভিনয় তাঁর কাছে বড় কিছু ছিল না। এভাবে একদিন সন্ধ্যাকালে বেনে-বৌ সেজে তিনি দুর্গাদাসের গৃহের অন্দরে প্রবেশ করে দীর্ঘক্ষণ বাড়ির মহিলাদের আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁর দাদার কণ্ঠস্বরে তিনি পাইন-গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনা দুর্গাদাসের চোখের সামনেই ঘটেছিল। তিনি পর্যুদস্ত হয়েছিলেন বটে তবে গদাধরের অভিনয়দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। পরে তিনিও মহিলাদের

আর পর্দার আড়ালে রাখেননি এবং সীতানাথ পাইনের ঘরে পরবর্তীকালে গদাধর কর্তৃক পুরাণ বা ভাগবতের আসর বসলে তিনিও সাগ্রহে তাঁর বাড়ির মহিলাদের সীতানাথের ঘরে যেতে অনুমতি দিতেন।

তাঁর জীবনীগ্রন্থে উল্লিখিত সখী সেজে সীতানাথ পাইনের কন্যাদের সঙ্গে হালদার পুকুরে জল আনতে যাওয়ার ঘটনা তাঁর সুঅভিনয় প্রবণতাই ব্যক্ত করে।

আরো লক্ষ্য করা যায় যে, বাল্যে গুসীরাণী নামে এক নাপিতকন্যাও তাঁর খেলার সাথী ছিলেন; তাঁর সঙ্গে তিনি ঘুসিম খেলতেন। কেবল গ্রামের কন্যারাই নন, গৃহবধূরাও তাঁর বিশেষ অনুরক্তা ছিলেন। লাহাবাড়ি ও পাইনবাড়িতে তাঁর প্রভাব অব্যাহত থাকলেও বৃন্দার-মা নামে এক ব্রাহ্মণীর ও খেতির মা নামে এক ছুতারনীরও বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন গদাধর।

খেতির মা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ না করে পারা যায় না, কারণ সে ঘটনা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজমানস প্রকৃতিরই পরিচয় নয়, সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের তথ্যও বটে। হীনবর্ণের অন্তর্ভুক্ত খেতির মার বিশেষ বাসনা হয়েছিল গদাধরকে নিজহাতে রান্না পরিবেশন করে খাওয়াবেন। ধনী কামারনীর ভগ্নি শঙ্করীকে তাঁর মনোবাসনা জ্ঞাত করালে শঙ্করীর মধ্যস্থতায় গদাধর একদিন খেতির মার গৃহে উপস্থিত এবং তাঁর স্বহস্তের রান্না অন্ন-ব্যঞ্জন তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পুঁথিকারের ভাষায়—

> "শূদ্রদত্ত ভোজ্য যেই বংশে নাহি চলে
> কুলাচার এত আঁটা জন্ম সেই কুলে॥
> একবার কুলরীতি করি আক্রমণ।
> শূদ্রদত্ত ভোজ্য আই করেন গ্রহণ।"

ঘটনার নাটকীয়তা এখানেই শেষ হল না। খেতির মার গৃহে, ঠিক সে সময় ব্রাহ্মণ বালক গদাধর তাঁর গৃহে অন্নব্যঞ্জন গ্রহণে ব্যাপৃত তখন গৃহকর্তা এসে হাজির। ছুতার এ দৃশ্য দেখে ভীষণ সংশয়কাতর হলেন। তাঁর বিশ্বাস উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা নিম্নবর্ণের ব্যক্তির গৃহে অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করলে পাপ বর্তাবে এবং সেই পাপমুক্তির প্রত্যাশায় ক্রোধোন্মত্ত ছুতার পায়ের খড়ম দিয়েই খেতির মাকে প্রহার করেছিলেন।

উপসংহার

শ্রীরামকৃষ্ণবাল্য অধ্যায়কে রোমাঞ্চকর আখ্যানবলী ভাবলে ঘটনার সরলীকরণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন বিশ্লেষণে তাঁর বাল্যকালীন ঘটনা সন্তর্পণে অনুসরণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেইখানেই পাওয়া যাবে উনিশ শতকের চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা। হীনবর্ণের ব্যক্তি অধ্যুষিত দক্ষিণরাঢ়ের সমাজ বাতাবরণে জাত্য কৌলীন্যের বিধিকে ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শৈশবেই।

তাঁর শৈশবপ্রজ্ঞাই, তাঁকে স্থাণু বঙ্গসমাজের বিধি-বিধানে খুশি হতে দেননি। উচ্চবর্ণের বিষ্ণু-মহেশ্বর অর্চনার সঙ্গে সঙ্গে হীনবর্ণের দেবতা মনসা ও ধর্মঠাকুরের প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। কুলীন কুলতিলক হিসাবে তাঁর জন্মপরিচয় থাকলেও তিনি সমাজের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী গরীব মানুষের সঙ্গে সঙ্গলাভ করে—তাদের গৃহে বসবাস করে—তাদের সঙ্গে সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তা সে সমাজের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মহিলা-পর্দানসিন প্রথা ভাঙ্গার আধুনিক মানসিকতা তখনও ব্রাহ্মসমাজের ইস্তাহারে ঢোকেনি; সেদিন গদাধর দুর্গাদাসকে পর্যুদস্ত করে পর্দার ভিতর হতে তাদের গৃহললনাদের মানুষের স্রোতে মানুষের মাঝে হাজির করেছিলেন। মানব-শৃঙ্খল গঠনের এই মহিমময় অধ্যায় বাদ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করলে তাঁর খণ্ডিত মূর্তিই দেখা যাবে—এই সত্য যেন আমরা না ভুলি।

উনিশ শতকের কৃষক আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ

উনিশ শতকের গণঅসন্তোষ বা কৃষক আন্দোলন কেবল 'ইতিহাসের বিশেষ উপাদান'ই নয়[১], শতকের **'নবজাগরণীয় চেতনার'** মূল্যায়নে এ এক আবশ্যিক শর্ত[২]। এই আন্দোলনের সঙ্গে উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক জীবনের সম্পর্ক নিবিড়[৩]। ঐতিহাসিকগণ[৪] বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে বহু গবেষণালব্ধ তথ্য জানিয়েছেন এবং এখনো সে বিশ্লেষণী প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত।

শ্রীরামকৃষ্ণ উনিশ শতকের চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। শতকের **দুই অর্ধব্যাপী** তাঁর বিস্তার ; এমনকি বিশ শতকের শেষ ধাপেও তাঁর চিন্তা ও চেতনার ধারা বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান[৫]। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রগতিবাদী চিন্তার সপক্ষে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের[৬] অসংখ্য লেখনী বর্তমান, তথাপি কিছু কিছু অগভীর রচনায় তাঁকে প্রগতিবিরোধী[৭] রূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত তথ্য অনুসন্ধানে অসমর্থ এজাতীয় ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় কেবল ইতিহাস-পুরুষের অবমূল্যায়নই হয় না—ইতিহাসের চূড়ান্ত অসম্মানও ঘটে।

উল্লিখিত শিরোনাম সম্পর্কে পাঠকও **অনুনাসিক** হতে পারেন ; তথাপি আমরা পাঠককে ধৈর্য ধরে ইতিহাস অনুসরণের জন্য অনুরোধ করব। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, উনিশ শতকের সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল ধর্মীয় পুরুষ বলেই বিখ্যাত ছিলেন না, সাংস্কৃতিক-পুরুষ বলেও বন্দিত ছিলেন[৮]। তাঁর ভাব ও ভাবনার অনিবার্য প্রতিফলন সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যে খুব ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে লক্ষিত[৯]। বহুক্ষেত্রেই তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপকার বলে কথিত। কাজেই এহেন পুরুষকার শতকের কৃষকসমাজের চরম বঞ্চনার ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হবেন না—এ ধারণা যেমন কষ্টকল্পিত তেমনই অবান্তর। এই উদ্যোগ সামনে রেখেই এই রচনার প্রস্তুতি। আমরা এ রচনায় দেখাতে চেয়েছি উনিশ শতকের কৃষক দুর্গতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব এবং কৃষক আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার স্বরূপ।

কৃষক আন্দোলনের পটভূমি :

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে শাসন কায়েম করলে প্রথমেই আঘাত পড়েছিল কুটিরশিল্পে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দেশের শিল্প বাণিজ্যকে ধ্বংসের

জন্য একাধিক কূট কৌশল অবলম্বন করেছিল। সেই তৎপরতায় কোম্পানী-সরকার এদেশে প্রস্তুত জিনিসের ওপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করেছিল। অন্যদিকে ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা জিনিসের ওপর শুল্ক রইল না বা নামমাত্র রইল[১০]। এইভাবে ব্রিটিশ পণ্যে যেমন দেশ ভরে গেল, রপ্তানী দীনতায় দেশীয় পণ্যের বাজারে এল মন্দা। ১৮১৪-তে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ব্রিটিশ শিল্পজাত আমদানী বস্ত্র দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ গজ। সেটা দু দশক পরে দাঁড়াল ৫ কোটি ১০ লক্ষ গজে; অপরদিকে ১৮১৪-তে ভারত থেকে ব্রিটেনে কাপড় গিয়েছিল ১ কোটি আড়াই লক্ষ গজ, সেটা ১৮৩৫-এ কমে দাঁড়াল মাত্র ৩ লক্ষ ৬ হাজার[১১]। বস্তুত এমন এক অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—দেশে পণ্যশিল্পের বাজার নেই অথচ দেশের কাঁচামাল ব্যাপক হারে বিদেশে চালান যাচ্ছে। দেশীয় কুটির শিল্পীরা জাতব্যবসা হারিয়ে কৃষিনির্ভর হল এবং অনেকেই পরিণত হল ক্ষেতমজুরে[১২]। এখানেই ব্রিটিশ শাসক থেমে থাকেনি; 'ব্রিটিশ সরকার পুষ্ট মিশনারিরা এদেশীয়দের ছলে-বলে-কৌশলে খ্রিস্টান করতে চেয়েছিল.... আর শুধু জনগণকে নয়, সিপাইদেরও নানা লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করতে তারা তৎপর ছিল।[১৩]

কোম্পানী শাসক কেবল দেশীয় শিল্প ধ্বংস করেই ক্ষান্ত ছিল না, তাদের কালো হাত কৃষিতেও বিস্তৃত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে নতুন ভূস্বামীদের পত্তন হল। প্রাচীন জমিদাররা বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী সরকারকে রাজস্ব জমা দিতে না পারায় তাদের হাত থেকে জমিদারি হাতছাড়া হয়েছিল। সেই সুযোগে ইংরাজদের দাক্ষিণ্যপুষ্ট কিছু শহুরে মুৎসুদ্দির দল নতুন জমিদার বা ভূস্বামী হয়েছিল। তারা থাকত শহরে; নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য দেখাত আর প্রজাস্বার্থে ছিল পূর্ণ উদাসীন। জমিদারির লাভের অঙ্কেই তারা খুশি থাকত; শহরে বসে প্রমোদে গা ঢেলে দিয়ে জমিদারি অন্যজনকে ইজারা দিত, সে আবার তা দিত অন্য একজনকে। এইভাবে জমিদার ও চাষীর মাঝে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সে-পত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদি ক্ষুদে জমিদার বা মধ্যস্বত্ব ভোগীর দল বিরাজ করত। তাদের সবারই শোষণের কেন্দ্রবিন্দু কৃষক[১৪]। সেই সময়ের অধিকাংশ জমিদারই ছিল অনুদার...তারা প্রজার দুরবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জমিদারির আয় যতদূর বাড়ানো যায় সে বিষয়েই অধিক তৎপর ছিল।[১৫] নব্য জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে চাষীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন চালাত; গ্রাম্য সমাজে জমিদাররাই ছিল সর্বময় কর্তা। সেই-ই বিচারের দায়িত্ব তুলে নিত নিজের হাতে নিজের খুশিমত। বকেয়া রাজস্বের জন্য চাষীদের অর্থদণ্ড তো দিতেই হত, সেই সঙ্গে চলত দৈহিক নির্যাতন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' জমিদারদের ১৮ প্রকার নির্যাতনের কথা উল্লেখ আছে।[১৬] এতেও জমিদাররা নিশ্চুপ থাকত না, তারা নিরীহ প্রজাকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করত; চাষীর নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জাল রসিদ দিয়ে, রাজস্ব বকেয়া পড়ার অপরাধে গরু, মোষ কেড়ে নিত, নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিও তাদের স্বভাবভুক্ত

ছিল।[১৭] চাষীর প্রতি জমিদারদের মনোভাব প্রসঙ্গে তদানীন্তন পত্রিকা, ক্যালকাটা খ্রীশ্চান এডভোকেটের সম্পাদক রেভাঃ টি. বোয়াজ মন্তব্য করেছেন 'ভারতের কৃষকরাই Probably the most oppressed people in the world'।[১৮]

ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি উনিশ শতকের কৃষকদের চরম দুর্দশায় উপনীত করেছিল—একথা সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন।[১৯] একদশক থেকে আর এক দশকে এই রাজস্বের হার বেড়ে যেত বহুগুণে। একে প্রথানুগ আমলের লাঙ্গল আর হীনস্বাস্থ্য বলদ সম্বলে চাষ এবং সে চাষও সম্পূর্ণ নির্ভর করত প্রকৃতির দয়ার ওপর। কোন কারণে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হলে সে বছর ফসল হত না। উনিশ শতকে প্রকৃতির দুর্ব্যবহারে বহুবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটেছে। ডব্লিউ. এস. লিলির হিসাবমত 'শতকের প্রথমার্ধে, সাতবার এবং দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে। তার মধ্যে ১৮৫১ থেকে ১৮৭৫ সালে অনুষ্ঠিত দুর্ভিক্ষের সংখ্যা আঠাব এবং মৃতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।'[২০] ফসলহীনতা, দুর্ভিক্ষ, গণমৃত্যু প্রজাদের অনাহারক্লিষ্টতা সত্ত্বেও তারা জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব থেকে রেহাই পায়নি। একে খাওয়ার সঞ্চয় নেই—তার ওপর রাজস্বের ভার ; তখন বাধ্য হয়েই চাষীরা ঋণের জন্য ধর্না দিত অন্যের দ্বারে।

এই সুযোগ বুঝে উনিশ শতকের গ্রাম্যসমাজে শোষক মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা ঋণ দিত কৃষকদের, কিন্তু কৃষক তার ফসল বিক্রির জন্য দায়বদ্ধ থাকত মহাজনের কাছে। মহাজন বাজারের চেয়ে কম দামে চাষীর ফসল কিনত। ফসল বাবদ উপার্জিত অর্থের প্রায় সবটাই ব্যয় হত জমিদারের রাজস্ব ও মহাজনের সুদ মেটাতে। ফলে পুনরায় চাষীকে মহাজনের কাছে হাত পাততে হত। গ্রাম্য মহাজনরা চড়া হারে সুদ নিত এবং সুদের হার থাকত ৫০% থেকে ৭৫%।[২১] সুদের কারবার লাভজনক বলে বহু জমিদারও মহাজনী কারবার করত।[২২] ব্রিটিশ রাজের সুপারিশক্রমে মহাজনরা কৃষকদের সম্পত্তি ক্রোক করে—জমি হস্তান্তরিত করে চাষীকে তার জমি স্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করত। এইভাবে কৃষক-মালিক থেকে জমি চলে যেত অকৃষক-মালিকের কাছে। জমির মালিক কৃষক হত 'ভূমি দাস' বা 'কৃষি মজুর'।[২৩]

কেবল ব্রিটিশ শাসক ও জমিদারদের সাঙ্গ-পাঙ্গ নয়, ঐ শতকে কৃষক সমাজের আর এক উপদ্রবের নাম নীলকর। তাদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী সমকালীন পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। নীলকররা জোর করে প্রজাদের দিয়ে নীল চাষ করত এবং দাদন দিয়ে তাকে দাসে পরিণত করত। যারা নীল চাষে আপত্তি করত তাদের শস্য লুঠ করা হত, তাদের কয়েদ করে রাখা হত এবং কখনো বা মিথ্যা মামলায় তাদের সর্বস্বান্ত করা হত।[২৪] সমকালীন পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী, হিন্দু পেট্রিয়ট, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি ছিল নীলকরদের অত্যাচার সংশ্লিষ্ট সংবাদে মুখর।

কৃষক আন্দোলনের ধারা :

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসক, জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজ সম্মিলিত হয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গর্জে উঠেছে। তাদের অসন্তোষের একাধিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। তার মধ্যে তিতুমীরের ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১) দুদু মিঞার ফরাজি আন্দোলন (১৮৪১), সিধু-কানহুর সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীলবিদ্রোহ (১৮৬০) ও ঈশানচন্দ্র রায়ের পাবনার প্রজাবিদ্রোহ (১৮৭৩) উল্লেখ্য।

তিতুমীরের ওয়াহাবী আন্দোলন নারকেলবেড়িয়া গ্রামকে সদর ঘাঁটি করে ছড়িয়ে পড়েছিল বসিরহাট ও বারাসাতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। তিতুমীর তাঁর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন জমিদার, মহাজন ও ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে। তিতুর সঙ্গীরা সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেনি। তিতু নিহত হয়েছিলেন। তিতুর আন্দোলন ব্যর্থ হলেও, বিদ্রোহের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি।[২৫]

তিতুর বিদ্রোহের পরই দুদু মিঞা ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরদের সমবেত করে জমিদার নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'জমি ঈশ্বরের দান, তিনি মানুষকে তা ভোগ করতে দিয়েছেন। সুতরাং যারা চাষ করে জমি তাদেরই এবং এই কারণে জমিদারদের কৃষক শোষণের কোন অধিকার নেই।[২৬] দুদু মিঞা জমিদারদের বেআইনি সেস আদায়ের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। প্রথমপর্বে দুদুমিঞা জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও পরবর্তী কালে তিনি এ আন্দোলনের গতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হননি। গবেষকগণ এ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে বলেন, 'ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, দূরদৃষ্টির অভাব ও দলমতনির্বিশেষে কৃষকসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারার জন্য ফরাজি আন্দোলন শেষপর্যন্ত ধর্মের চোরাবালিতে পথ হারায়।[২৭]

মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা সিধু-কানহুর নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বিদ্রোহীরা মহাজনদের ওপর হামলা চালিয়েছিল এবং তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিদ্রোহের বিস্তার ছিল বিহারের একাংশ, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিরাট অংশ জুড়ে। কেবল পুরুষই নয়, মহিলারাও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।[২৮] সাঁওতালরা কেবল মহাজনদের ধ্বংস করতেই উদ্যত ছিল না, ব্রিটিশ শাসকের দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেট, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার, রেলওয়ে কনট্রাকটর প্রভৃতি ইংরাজ পৃষ্ঠপোষকরাও আক্রান্ত হয়েছিল।[২৯] এর প্রতিবাদে সসৈন্যে ব্রিটিশরাজ সাঁওতাল নিধন যজ্ঞে নেমেছিল। তারা সাঁওতাল গ্রামগুলো ধ্বংস করেছিল ; বহু সাঁওতালদের বন্দী করেছিল। এবং এই বিদ্রোহের দুই নেতা সিধু ও কানহুকে ফাঁসির মঞ্চে ঝোলান

হয়েছিল।[৩০] রসদ, অর্থ ও ব্যাপক জনসমর্থনের অভাবে এই বিদ্রোহ স্তিমিত হলেও নিরীহ সাঁওতালরাও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস উনিশ শতকেই দেখিয়েছিল।

এরপর এসেছিল ১৮৫৭-সালের মহাবিদ্রোহ। ব্যারাকপুরের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে। সিপাহীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধে। তার ওপর 'কালো আদমী' দেশীয় সিপাহীরা অধিকাংশ ছিল দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামবাংলার কৃষক সন্তান। তারা আগে থেকেই ব্রিটিশ শাসক ও তার তাঁবেদার জমিদারদের অত্যাচার সম্বন্ধে অবহিত ছিল। তাছাড়া, দেশীয় সিপাহীরা ইংরাজ সৈন্যদের তুলনায় অর্ধেক মাইনে পেত। সেই কারণে তাদের ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। সুযোগ বুঝে যখন মীরাট, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, বাংলাদেশেও সে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৫৭ সালের নভেম্বরে বিদ্রোহী পদাতিক বাহিনী চট্টগ্রামের জেল ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করে ও ট্রেজারি লুট করে। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বহরমপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বহুসহস্র স্থানীয় কৃষক সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিতে বহরমপুরে জমায়েত হয়েছিল।[৩১] সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপক বিস্তৃতি দেখে ইংরাজ শাসক সচেতন হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনে তারা নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল, উন্নত রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্যে শেষপর্যন্ত তারা বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল ; তথাপি একথা বলা যায় যে, এ জাতীয়-বিদ্রোহ—এর মধ্যেই বিদ্রোহাত্মক চেতনা সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।[৩২]

অতঃপর নীল বিদ্রোহ নীলকরদের বাধ্যতামূলক নীলচাষ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৮৫৯-৬০ সালে সমগ্র বাংলায় ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে ওঠে। ১৮৬০-এর বাংলায় লক্ষ লক্ষ কৃষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—'প্রাণ দেব, তবু নীল বুনব না।' হিন্দু-মুসলমান চাষীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যাপক গণসংগ্রাম শুরু করেছিল। নীল বিদ্রোহ সরকার দমন করলেও শেষপর্যন্ত নীলকরদের অত্যাচার কিছুটা কমেছিল।

নীল বিদ্রোহের কয়েক বছরের মধ্যে পাবনা জেলায় কৃষকরা ঈশান চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জমিদারদের বেআইনি সেস ও খাজনাবৃদ্ধির প্রতিবাদেই এই বিদ্রোহের সূচনা। উত্তেজনা মুহূর্তে বিদ্রোহীরা কিছু কিছু লুঠপাঠ, গ্রামে অগ্নিসংযোগ, কনস্টেবলদের প্রহার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্মে অংশ নিলেও বিদ্রোহের মুখ্য নেতৃত্ব নিয়মানুগ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিল।[৩৩] হান্টার সাহেব এই বিপ্লবকে 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন' বলেই অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক স্বপন বসুর বিবরণ অনুসরণে জানা যায়, বিদ্রোহী কৃষকরা প্রথমে দলবদ্ধ হয়ে মহকুমা শাসকের কাছে জমিদারের অত্যাচার কাহিনী ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের দাবি জানাতে থাকে এবং অবশেষে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে।[৩৪] বিদ্রোহ ক্রমশঃ ব্যাপক হলে সরকার তা দমনে সচেষ্ট হন। উপদ্রুত এলাকায় ক্যাম্প

বসে—বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিদ্রোহী নেতা ঈশান চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের হয়। বিদ্রোহীদের বন্দী করে দণ্ড দিয়ে সরকার বিদ্রোহের গতি মন্দীভূত করলেও সরকারকে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণয়ন করতে হয়েছিল।[৩৫]

মুখ্যত বিপ্লবের পটভূমিতে (দুই-এর দশক থেকে সাতের দশক) আমরা লক্ষ্য করেছি, সমাজজীবনে কৃষক শোষণই মুখ্য আর তার বিরুদ্ধেই গণ-অসন্তোষ সরকার, জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার সর্বশক্তি দিয়ে বিদ্রোহসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সত্য, কিন্তু পারেনি বিদ্রোহী চেতনাকে স্তব্ধ করতে। আর সেই সঙ্গে স্মরণ করতে হয়—প্রতিক্ষেত্রেই জমিদাররা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত বিক্ষোভ মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকারের হাত শক্ত করেছে। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' দমনে সরকার দেশীয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য প্রার্থী হলে মুর্শিদাবাদের নবাব ২৯টি হাতি, বেশ কিছু ঘোড়া ও ১০০ জন সিপাই বিদ্রোহীদের দমনের জন্য মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাণী রাসমণি, প্রাণনাথ চৌধুরী, রমাপ্রসাদ রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতিরাও হাতি পাঠালেন।'[৩৬] সিপাহী বিদ্রোহের কালেও তাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন দেখা যাননি। সিপাহী বিদ্রোহে যখন ইংরাজরা শঙ্কিত, সুবিধাভোগী, বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ তখন রাজভক্তি-প্রকাশে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সভা-সমিতি, আনুগত্য সূচক আবেদন প্রেরণ ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে ইংরাজ তুষ্টিই ছিল তাদের ধ্যান-জ্ঞান।[৩৭] ১৮৫৭ সালের ২২ মে গৃহীত একটি প্রস্তাবে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (দেশীয় জমিদারদের দ্বারা পুষ্ট সভা) দিল্লী ও মীরাটের বিদ্রোহীদের আচরণের নিন্দা করেছিল। নীলবিদ্রোহ সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা যায়। নীলবিদ্রোহে অনেকে জমিদারদের প্রগতিবাদী ভূমিকা লক্ষ্য করেন কিন্তু অধুনা জনৈক গবেষক অসংখ্য তথ্যসহ দেখিয়েছেন যে, জমিদাররা নীলবিদ্রোহেও কৃষকদের বিরুদ্ধাচরণই করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'দুচারজন জমিদার স্বার্থজনিত কারণে কৃষকদের সহায়তা করলেও গোটা নীলবিদ্রোহকে জমিদারদের স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা এক আন্দোলন বললে এর ওপর অবিচার করা হবে। .... এ ব্যাপারে (নীলবিদ্রোহ প্রসঙ্গে) কোথাও কোথাও জমিদাররা তাদের (কৃষকদের) উত্তেজিত করলেও বিপদের মুহূর্তে তারা পাশে এসে দাঁড়ায়নি। অর্থাৎ তাদের ভূমিকা ছিল শাসকগোষ্ঠীকে পরোক্ষ সহযোগিতায়।'[৩৮] কাজেই জমিদার শ্রেণীকে 'ব্রিটিশ রাজের মিত্র শক্তি' রূপে বিশেষিত করা খুব সঙ্গত অভিধা এবং এও ঠিক যে, ভারতীয় অর্থনীতিতে জমিদারদের কোন রূপ উৎপাদনশীল ভূমিকা ছিল না।[৩৯]

কৃষক আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সহমর্মিতা :

কৃষক শোষণের যন্ত্ররূপে যে জমিদারতন্ত্র ব্রিটিশ শাসকের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছিল তাকে চিনতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুল হয়নি। কারণ এ শোষণের অভিজ্ঞতা তাঁর আশৈশবের। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের একাধিক ঘটনা উল্লেখ করা যায়—যা উনিশ শতকের কৃষক শোষণ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার পরিচয় দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে হলেও তাঁদের আদিনিবাস কামারপুকুরে নয়। কামারপুকুর থেকে প্রায় তিনকিলোমিটার পশ্চিমে 'দেরে' গ্রামে ছিল তাঁদের আদি নিবাস।[৪০] সময় ১৮১০-১৮১৪ সাল। ঐ দেরে গ্রামে তখন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা), স্ত্রী, পুত্র (জ্যেষ্ঠ) ও কন্যা (জ্যেষ্ঠা) সহ বসবাস করছিলেন। কৃষিজফসল ও পৌরোহিত্য কর্মে তাঁর আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যও ছিল না। এমন সময় গ্রামের জমিদার ('দেরে' গ্রাম সংলগ্ন 'সাতবেড়ে' গ্রামের জমিদারের বাস ছিল) রামানন্দ রায় দেরে গ্রামের জনৈক ব্যক্তির ওপর অসন্তুষ্ট হলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার সূচনা করেন। এই মামলায় জমিদারের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তিনি ক্ষুদিরামকে জানালে, সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরাম জমিদারের অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। তখন জমিদার তাঁর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেন। মামলায় জমিদার ডিক্রি পান এবং ক্ষুদিরামের সমস্ত সম্পত্তি এমনকি ভিটাবাড়িও নিলামে কিনে নেন।[৪১] এইভাবে চল্লিশ বছর বয়সে ক্ষুদিরাম নিঃস্ব ও বাস্তুচ্যুত সর্বহারায় পরিণত হলেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে তিনি বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর সহৃদয়তায় কামারপুকুরে তাঁর বাড়িরই একাংশে সপরিবারে আশ্রয় পান এবং ঐ বন্ধুরই দেওয়া কিছু জমির (পুরা দেড় বিঘা) ওপর নির্ভর করেই পরবাসী হয়ে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। ক্ষুদিরামের সর্বহারার পরিণতি ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনা সমকালীন 'জমিদারিতন্ত্রের' চেহারাকে পরিব্যক্ত করে। এ প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ উল্লেখ করেছেন, 'জমিদার (রামানন্দ রায়) বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন কারণে কাহারও উপর কুপিত হইলে তিনি ঐ প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার পুত্রকন্যাদির মধ্যে কেহই জীবিত ছিলেন না। লোকে বলে, প্রজা-পীড়ন অপরাধেই তিনি নির্বংশ হইয়াছিলেন।'[৪২] আমাদের বিশ্বাস সংসার জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয় জমিদার রামানন্দ রায়ের এ অপকীর্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৃষক সমস্যা সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্র বিহারের দেওঘর। ১৮৬৮ সালের ২৭ জানুয়ারী তিনি হৃদয়নাথ (ভাগ্নে) ও জমিদার মথুরামোহন বিশ্বাস সহ কাশী বৃন্দাবন তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছিলেন।[৪৩] পথে দেওঘরের ৺বৈদ্যনাথ ধামে অবতরণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি শহর থেকে বাইরে এসে এক দরিদ্র সাঁওতাল পল্লীতে উপস্থিত হয়েছিলেন।[৪৪] সেই দরিদ্র পল্লীর নিখুঁত বিবরণ চিত্রিত করেছেন

সন্ন্যাসী দুর্গাপুরী: 'তাহারা অত্যন্ত দুঃখী, তৃণপত্রে তাহাদের কুটীর, তাহাও এমনই জীর্ণ যে রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা হয় না। জীর্ণ কুটীরও সকলের ভাগ্যে জোটে না, কেহ আবার বৃক্ষতলেই আশ্রয় লইয়াছে;...... তৈলাভাবে কেশ রুক্ষ, অন্নাভাবে দেহ জীর্ণ! ক্ষুধার জ্বালায় বালক-বালিকাগণ চিৎকার করিতেছে, শিশুভূমিতলে লুটাইতেছে, নারীর বসন শতগ্রন্থিযুক্ত, লজ্জা নিবারণে অক্ষম।'[৪৫]

সেই সময় বিহারের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ চলছে। এই দৃশ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে চঞ্চল করেছিল। তিনি মথুরবাবুকে উল্লিখিত আদিবাসী পল্লীর দুঃখের বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তো মা-র দেওয়ান; এদের একমাথা ক'রে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।'[৪৬]

তাঁর এই উক্তির প্রতিবাদ জানিয়ে মথুরবাবু বলেছিলেন যে, 'পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার মত অর্থ তাঁর নাই।'[৪৭] মথুরবাবুর কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ দূরে জমায়েত সর্বহারা সাঁওতালদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লেন এবং তীক্ষ্ণ স্বরেই মথুরবাবুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোর যেখানে খুশী তুই যা, করগে তীর্থধম্ম। আমি এখানেই রইলুম এই অনাথ কাঙ্গালদের সঙ্গে। কোথাও যাব না আমি।'[৪৮] শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই শুরু করলেন সত্যাগ্রহ।[৪৯] মথুরবাবুর কোনবক্তব্যই শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর দাবি থেকে সরাতে সক্ষম হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের দাবি অনুযায়ী দেওঘরে মথুরামোহনকে কলকাতা থেকে খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ আনিয়ে সেই আদিবাসী পল্লীতে বিতরণ করতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শিশুর মত আনন্দোচ্ছল হয়ে দেখেছিলেন, দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট অনাথ নরনারীর তৃপ্তির হাসি।

শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নদীয়া জেলার রাণাঘাট সংলগ্ন কলাইঘাটা গ্রাম। সময় ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাস (শীতকাল)।[৫০] দেশভ্রমণ পথে জমিদার মথুরামোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ রাণী রাসমণির নদীয়ার জমিদারি রাণাঘাটের কলাইঘাটায় (পূর্বনাম—ক্লাইভঘাটা) হাজির হয়েছিলেন।[৫১] চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রাম। পরপর দুবছর খরায় মাঠের ফসল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রজাদের দুঃখ চরমসীমায় উঠেছিল। তাই তাদের পক্ষে জমিদারিতে খাজনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার সরেজমিন তদন্তে হাজির হয়েছিলেন জমিদার মথুরামোহন। পাইক, বরকন্দাজ, লোক-লস্করসহ মথুরামোহনের বজরা এসে ভিড়েছিল কলাইঘাটার ঘাটে। জমিদারের আগমন সংবাদে দূরগ্রাম থেকে শত শত বুভুক্ষু নিরন্ন ছিন্ন বস্ত্রের কঙ্কালসার দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসী এসে জমায়েত হয়েছিল ঘাটের পাশে! উদ্দেশ্য—জমিদারের কাছে খাজনা আদায়জনিত মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচার থেকে সে বছরের জন্য রেহাই এর আবেদন; যেহেতু পরপর দুবছর অজন্মা (খরা) গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বজরা থেকে লক্ষ্য করেছেন বুভুক্ষু মানুষের সমাবেশ।

তিনি মথুরকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কারা'?

মথুরবাবুর উত্তর: 'ওরা আমার প্রজা'।[৫২]

শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে বিস্ময়: 'এরাই তোমার প্রজা? তুমি এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবে? কিন্তু ওরা নিজেরাই যে খেতে পায় না।'[৫৩]

তাঁর বক্তব্যে উদাসীন মথুরবাবু তারপর তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে জমিদারি ও রাজ-বিষয়ক কথাবার্তা চালাতে থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবাদে কঠিন হলেন। তিনি মথুরবাবুকে জানিয়ে দিলেন, 'ক্ষুধার্ত মানুষের পয়সা দিয়ে যে ভবতারিণীর পূজা হয়, সেখানে তিনি আর পূজারী থাকতে রাজী নন।'[৫৪] সেই মুহূর্তেই তিনি অসহায় দরিদ্রমানুষের স্বার্থে শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন জমিদারকে, এই দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে যদি খাজনা আদায় করা হয় তাহলে তিনি আর ফিরে যাবেন না দক্ষিণেশ্বরে ; আজীবন থেকে যাবেন এই ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে![৫৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে জমিদার মথুরবাবু বলেছিলেন, 'প্রজাদের খাজনা মকুব করা যায় না।'[৫৬]

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবাদে অটল।

তিনি জমিদারকে কড়া স্বরেই জানিয়ে দিলেন যে, এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষকদের খাজনা মকুব করতে হবে এবং তোমাকে এই দুর্দিনে অর্থসাহায্য করতেই হবে।[৫৭]

মথুরবাবু প্রমাদ গুনলেন।

তিনি বারবার শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এ জাতীয় দাবি প্রত্যাহার করে নিতে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দাবি থেকে একটুও সরতে রাজী ছিলেন না। অগত্যা মথুরকে রামকৃষ্ণের দাবির কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল এবং তার দাবি অনুযায়ী কলাইঘাটার প্রজাদের সে বছরের খাজনা মকুব করতে হযেছিল। এমনকি খরাপীড়িত প্রজাদের ত্রাণবাবদ অর্থ ব্যয়ও করতে হয়েছিল। কলাইঘাটার মানুষের কাছে সে-স্মৃতি আজও অম্লান।

পাঠক এখানে প্রশ্ন রাখতে পারেন, এ ঘটনা মথুরবাবুর বদান্যতার বহিঃপ্রকাশে অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর (ভক্তি ও ভালবাসা মিশ্রিত) সমবেদনা ; অর্থাৎ দরিদ্র কৃষকস্বার্থে শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক এষণা এক্ষেত্রে গৌণ। এ প্রসঙ্গে আমরা পাঠককে অবগত করাতে চাই, মথুরবাবু উত্তরাধিকারসূত্রে যে জমিদারি তদারকী করেছেন সেই জমিদারির মালিক রাণী রাসমণি ধর্মপরায়ণা হলেও যথেষ্ট প্রজাদরদী ছিলেন না এবং সাধারণ প্রজাদের দুরবস্থার দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ না করে জমিদারির আয় বাড়াতেই সচেষ্ট ছিলেন।[৫৮] এমনকি উনিশ শতকের গণ-অসন্তোষ কালে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছেন।[৫৯] আমাদের আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জমিদার মথুরবাবুর বেতনভুক কর্মচারীমাত্র এবং জমিদারের খাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ পুরোহিত রূপেই উল্লিখিত ছিলেন—তিনি 'ছোট ভট্চাজ'—তাঁর মাসিক বরাদ্দ ছিল নগদ পাঁচ টাকা।[৬০] জমিদার মথুরবাবুর বৈষয়িক বুদ্ধি প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য উল্লেখ করেছেন, 'রাণী রাসমণির কনিষ্ঠ জামাতা মথুরামোহন যাবতীয় কাজে তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দক্ষতার সহিত জমিদারি পরিচালনা করিয়া তাঁহার বিষয়-আশয় বাড়াইয়াও ছিলেন'।[৬১] ক্রিস্টোফার ইশারউড্[৬২]

তাঁর বই-এ (রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ) উল্লেখ করেছেন, 'কাশী ভ্রমণকালে বন্ধু জমিদারবাবু আসতো, মথুর তাঁদের সঙ্গে বৈষয়িক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। মথুরের এই ব্যবহারে রামকৃষ্ণ মানসিক ক্লেশ পেতেন। একা বসে কাঁদতেন আর বলতেন, 'এর চেয়ে যে দক্ষিণেশ্বরে আমি ঢের ভালো ছিলাম।' উল্লিখিত পুস্তকে লেখক আর একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (একবার) প্রতিবেশী এক জমিদারের সঙ্গে অকারণ দাঙ্গা বাধিয়ে দিলেন—সদলবলে সেখানে চড়াও হ'য়ে এমন হামলা করলেন যে, অনেক মানুষ খুন হল। ঘটনাটি আদালত অবধি গড়াল। কোর্ট থেকে মথুরের নামে পরোয়ানা জারি হল।[৬৩]

এই সমস্ত প্রমাণ সম্বলে আমরা সহজেই মন্তব্য করতে পারি যে, মথুরবাবু জবরদস্ত জমিদার ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা অবিসংবাদী সত্য, কিন্তু সেই সূত্রে তিনি জমিদারির আয় বর্জনে বাধ্য হবেন একথা ভাবার সঙ্গত কারণ নেই এবং সেই সঙ্গে জমিদারির সঞ্চিত পুঁজিকে ত্রাণ তহবিলে পরিণত করতেও তিনি বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু বাধ্য হয়েছিলেন এবং এই বাধ্যকরণের শর্তই শ্রীরামকৃষ্ণের আন্দোলন। এই আলোচনার সূত্র ধরে আরো বলা যায় যে, আমরা প্রামাণিক গ্রন্থসূত্র হতে কেবল ঘটনাই অবগত হয়েছি এবং জানতে পারিনি কতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণকে সত্যাগ্রহে থাকতে হয়েছিল। যেহেতু মথুরামোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথনে আমরা জমিদারের কোনরূপ প্রজাপালনের ইঙ্গিত পাই না, সেই কারণে আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর আন্দোলন নিয়ে দীর্ঘসময় কাটাতে হয়েছিল।

কৃষক স্বার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-সত্যাগ্রহের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ:

উল্লিখিত আলোচনা হতে আমরা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারি।

প্রথমতঃ, সমকালীন জমিদারতন্ত্রের অত্যাচারের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক তথ্যে জমিদারদের অত্যাচারের তালিকায় প্রতিহিংসাপরায়ণতা, মিথ্যা সাক্ষীর জোরে হয়কে নয় করা, জমিদারের আদেশ ভঙ্গকারীর প্রতি দুর্বিষহ অত্যাচার করা, দরিদ্র প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা প্রভৃতি যে অমানবিক জমিদারি-প্রবৃত্তি[৬৪] উল্লেখ আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি অনুরূপ ভাষাই বক্ত করে।

দ্বিতীয়ত, সমকালীন দুর্ভিক্ষ ও কৃষক নৈরাশ্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট রাণাঘাট ও দেওঘরের ঘটনা যথাক্রমে ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ সালের। ঐ সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলো যে দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছিল সরকারী রিপোর্টে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৫] The Cambridge Economic History of India পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, '১৮৬৬-৬৭ সালে বিহারে ২৬,১৯১ বর্গমাইল এলাকা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়, আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৭,৭৩৯,৭১৭, মৃতের সংখ্যা হল ১৩৫,৬৭৬ জন

এবং দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনরূপ ত্রাণ সরবরাহ পাননি।[৬৬] উনিশ শতকের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও কৃষক অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে এ.আর. দেশাই উল্লেখ করেছেন, ১৮৭০ সাল নাগাদ হস্তশিল্প ও কারিগরি শিল্পের পঙ্গুতা ব্যাপক হয়ে ওঠবার ফলে কৃষির ওপর চাপ ভয়াবহ রূপে বেড়ে যেতে লাগল। ১৮৭০ সালে কৃষিমন্দার ফলে কৃষকদের খুব ক্ষতি হয় এবং তাদের মধ্যে ঋণগ্রস্ততা খুব বেড়ে যায়। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে পরপর কয়েকটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে। এবং এইসব দুর্ভিক্ষের ফলে বিপুল পরিমাণ জীবনহানি ঘটেছিল।'[৬৭] কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঐতিহাসিক তথ্য তুল্য।

তৃতীয়ত, উনিশ শতকের গণ-অসন্তোষের উৎসের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া : আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ব্রিটিশ শাসক, জমিদার ও তার তাঁবেদার শক্তিগুলির শোষণের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়েছিল একাধিক গণ-অসন্তোষ ; কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতায় তারা সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পারেনি। গণ-অসন্তোষগুলির ব্যর্থতার পিছনে দেশীয় জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা এক বিশেষ শর্ত হিসাবে কাজ করেছে[৬৮] এবং এই প্রকৃতি কী সিপাহী বিদ্রোহ, কী নীলবিদ্রোহ সবক্ষেত্রেই কম-বেশী একইভাবে কাজ করেছে।[৬৯] উল্লিখিত আলোচনায় কৃষক স্বার্থের প্রতিকূল শক্তিকে সনাক্তকরণে শ্রীরামকৃষ্ণের তৎপরতা লক্ষ্যণীয় বিষয়। কাজেই কৃষক আন্দোলনের তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে।

চতুর্থত, কৃষক আন্দোলনে ধর্মের প্রসঙ্গ : অধুনা ঐতিহাসিকগণ কৃষকবিদ্রোহের সামগ্রিক রূপ বোঝাতে অর্থনৈতিক কারণকে এককশর্ত বলতে নারাজ, তাঁরা বিদ্রোহীদের মানসিকতা বিশ্লেষণের ধর্মের প্রভাব নিয়েও বিশেষ আলোচনায় ব্রতী[৭০]। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা ও জাতপাতের সমস্যা ছিল এবং সেই কারণে এই সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রাম হয়ে উঠতে পারেনি।[৭১] অনেক ক্ষেত্রেই 'ধর্মের চোরাবালিতে' আন্দোলন বিভ্রান্ত হয়েছে।[৭২] সেই বিচারে কৃষক স্বার্থের অনুকূলে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যাগ্রহ কোন ধর্মতান্ত্রিক উন্মাদনার অভিব্যক্তি নয়—তা মানবতাবাদের সুতীব্র আকৃতি রূপে চিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে আমরা রোঁমা রোঁলার উদ্ধৃতি স্মরণ করতে পারি (দেওঘর ও রাণাঘাটের) তীর্থ যাত্রাকালে রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন যদি না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি এমন কিছুর সন্ধান পাইলেন, যাহা আমাদের পশ্চিম দেশবাসীর কাছে গভীরতর এক অর্থ বহিয়া আনিবে। তিনি সন্ধান পাইলেন, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার।'[৭৩]

পঞ্চমত, এই আন্দোলনের প্রকৃতিগত বিশ্লেষণ : শতকের কৃষক আন্দোলনগুলির মুখ্য প্রকৃতি ছিল সশস্ত্র আন্দোলন। সেই বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের আন্দোলনকে 'অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন' রূপে চিহ্নিত করা যায়।[৭৪] পরবর্তীকালে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডিভেঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কোটি কোটি নিরক্ষর জনসাধারণের (হিন্দু-মুসলমান, শিখ জাতির অন্তর্ভুক্ত কৃষক ও শহরের লোকজন)

মধ্যে গণআন্দোলনে পরিণত করার যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গান্ধীজী সংগঠন করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে তার পথিকৃৎ বলা যায়।[৭৫] গান্ধীজী এই আন্দোলনের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্য মনীষী আমোরিডি রিনকোর্ট এবং প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু।[৭৭]

ষষ্ঠতঃ. দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকসমাজের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া: উনিশ শতকের কৃষক আন্দোলনের পূর্বশর্ত হিসাবে আমরা লক্ষ্য করেছি সমকালীন সমাজে কৃষকদের দুরবস্থার কথা; একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসক, জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের অমানবিক শাসন ও শোষণ, অনাধারে তেমনি প্রকৃতির নির্মম অস্বাভাবিকতা—অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির প্রকোপ।[৭৮] তারফলে ফসল হয়নি—ফলে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হয়েছিল কৃষকসমাজকে। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক সমাজে ত্রাণ সরবরাহজনিত ব্যয়ের যে তালিকা দর্শান হয়, তারও শুরু আটের দশক থেকে।[৭৯] দুর্ভিক্ষজনিত ক্ষয় ক্ষতির পর্যালোচনার জন্য যে ফেমিন কমিশন (Famine Commission) গঠিত হয়েছিল তাও শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট ঘটনার অনেক পরে।[৮০] সেই বিচারেও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ত্রাণ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা এবং জমিদার শাসক কর্তৃক তার প্রচলনের মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

উপসংহার: শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজসংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তথাপি আমরা লক্ষ্য করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ মানসিকতা জমিদারতন্ত্রের প্রতিকূলেই ছিল। কৃষক সমাজের করভার সম্পর্কে তাঁর সম্যক অভিজ্ঞতার কথাও আমরা অবহিত হয়েছি। সেই সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি কেবল কৃষক আন্দোলনের শোভন সমর্থকই নন—তিনি কৃষক স্বার্থের দাবিতে কৃষকদের নিয়ে নিজেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে নেমে এসেছিলেন তাদেরই মাঝে। এখানেই তিনি ক্ষান্ত নন, বুভুক্ষু কৃষকদের অন্ততঃ একদিনের খাদ্য সরবরাহ করে তবে তিনি শান্ত হয়েছেন এ জাতীয় ঘটনার একাধিক নজির ঐ শতকে বিরল। পরিশেষে আমাদের বলতেই হচ্ছে, প্রবীণ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজ[৮২] উনিশ শতকের জাগরণের ইতিবাচক সিদ্ধান্তের অনুকূলে ১৮৫৭—১৯১১ কালপর্বে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে কৃষক স্বার্থের স্বপক্ষে যে তথ্য দেখিয়েছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট এ ঘটনা—তারই এক সংযোজনক্ষম নমুনা।

১০৩